নৌকাবিলাস

সমরেশ মজুমদার

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

NAUKABILASH
a novel by Samaresh Majumder
Published by Amar Sahitya Prakashan,
7 Tamer Lane, Cal 9

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭১
দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রকাশক :
এন. চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট : অঙ্কন
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শঙ্কর ঘোষ

স্নেহাস্পদেষু

নৌকাবিলাস

নৌকাবিলাস

াঝে মাঝে মাইকেল সাহেবের হোটেলের ছাদে টাঙানো পতাকা লাগানো াশটা জেগে উঠছে আবার ডুবে যাচ্ছে। কোথাও মাটির আর কোন চিহ্ন নই। যেদিকে তাকাও শুধু ঢেউ আর ঢেউ। এই নৌকো গেল গড়িয়ে ঢউ-এর গর্তে, এই উঠল ছিটকে তার মাথায়। নৌকোর এই মাথায় সে, ওপাশে ব্রজকাকা। এই অবধি এলেই ব্রজকাকা থম মেরে যায়। ওই াইকেল সাহেবের হোটেলের চিহ্নটাকে হারাতে কিছুতেই রাজি নয়। নেই নেই করেও গোটা সাতাশ নৌকো বের হয় প্রতি মাঝরাতে। ক-জনের হিম্মত আছে সাগরের এই তল্লাট পর্যন্ত আসার!

'ঠিক আছে ভদ্দর, এবার ঘোরা।' ব্রজকাকা জাল তুলতে তুলতে আদেশ দিলেন। বয়সে অন্তত কুড়ি বছরের বড়। নৌকোয় ওর কথাই শেষ কথা। কারণ নৌকোটাই ওর। ভদ্র চারপাশে তাকাল। সূর্যদেব উঠেছেন অনেকক্ষণ কিন্তু এখন ঢেউ-এরা তাঁকে নিয়ে খেলা করে চলেছে। সাগরের ওপর শুধু রঙের খেলা। ব্রজকাকা কেন, অনেকেই বলে, এই যে সাগর তার কোন শেষ নেই। তবে যত ভেতরে যাবে তত সে শান্ত। শক্ত হাতে একটা বড় ঢেউ সামলে নিল ভদ্র। আড় চোখে দেখে নিল মাছ কতটা সংগ্রহ। পাইকার বসে আছে বালির চরে। ষাট ভাগ ব্রজকাকার, চল্লিশ তার। সত্তর আশি টাকার মাল উঠলেই সবাই খুশিতে দাঁত বের করে। বালিতে নৌকো তুলে জাল ছড়িয়ে এমন ভঙ্গিতে মাছ বাছে যেন রাজ্য জয় করে এল। সাগরের জলে মাছেরা আজকাল খুব হুঁশিয়ার হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বিচের কাছাকাছি কেউ আসতেই চায় না চট করে। অনেক নৌকোয় তিরিশ টাকার মালও উঠছে না।

ভদ্র চেঁচিয়ে বলল, 'আর একটু কাকা। ও পাশটায়।'

ব্রজ মাথা নাড়লেন, 'না-না। পাইকার ফিরে যাবে। তখন এগুলো নিয়ে কোন গুষ্টিপুজো হবে?' কথাগুলো হচ্ছিল চেঁচিয়ে। হাওয়ার ধমক বাজিয়ে। ভদ্র মুখ ফেরালো। ঢেউ-এর তালে ওঠা-নামায় সে চমকে উঠল। মাইকেল সাহেবের হোটেলের পতাকা দেখা যাচ্ছে না। ঢেউ তাদের

সরিয়ে নিয়ে এসেছে কোথায়! সে বৈঠা চালালো। ব্রজকাকা চিৎকার করলেন, 'অ্যাই হারামজাদা, হচ্ছেটা কি?'

'পতাকা নেই! পতাকা নেই!' যেন হুড়মুড় করে আতঙ্কটা ছিটকে বেরিয়ে এল পেট থেকে। চকিতে মুখ ঘোরালেন ব্রজকাকা। মুখটা যেন চুপসে গেল আচমকা, 'ঘোরা ঘোরা, নৌকো ঘোরা।' আর্তনাদ বাতাসকে চটকে দিল। কোনদিকে ঘোরাবে? যেদিকে তাকাও জল আর জল। ব্রজকাকা সূর্যদেবকে দেখে নিয়ে যে দিকটায় হাত দেখালেন নৌকো চলল সেই দিকে। এখন না হয় সূর্যদেব ঠিক জলের ওপরে, মাথা ডিঙিয়ে গেলে হয়ে যেত চিত্তির। নৌকো চলছে আর সেই সঙ্গে ব্রজকাকার মুখ। সমানে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দিক্ পাওয়ার পর বুক থেকে আতঙ্কটা নেমে গিয়েছিল ভদ্রর। এখন বেশ মজা লাগছে। ওই তো মাইকেল সাহেবের হোটেলের পতাকা। সে মুখ ফেরাল। ওপাশে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে জল আর জল। সেই জলে কত না মাছ, কত না রহস্য। সেই জলের শেষে যে দেশ তার নাম 'অস্ট্রেলিয়া'। নামটা মনে পড়ে যাওয়ামাত্র চকিতে মুখ ফেরাল ভদ্র। কত জল ডিঙোতে হবে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে। এই তুই মাস ধরে ক্রমাগত এই শব্দটা তাকে বিহ্বল করে তুলছে। নৌকোর ওপাশ থেকে ব্রজকাকা চিৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাই শুয়ার, হচ্ছেটা কি!' তাড়াতাড়ি সচেতন হল ভদ্র। শেষ ঢেউ পর্যন্ত টান টান হয়ে থাকতে হবে, সমুদ্র কখনই অসতর্ককে ক্ষমা করে না। নৌকো ফির-ছিল তরতরিয়ে তীরের দিকে।

দেড় মাইল লম্বা সি-বিচটাকে নিয়ে যে জনপদ গড়ে উঠেছে তার বয়স বেশি নয়। কিন্তু এর মধ্যেই চমৎকার চারটে হোটেল মরশুমে উপচে পড়ছে। জন মাইকেল নামের যে সাহেব তিরিশ বছর আগে প্রায় অখ্যাত এই সমুদ্রতটে রেস্টহাউজ তৈরি করেছিলেন তিনি এখনও আছেন। একটু একটু করে তাঁর হোটেল মাথা তুলেছে। দোতলা হয়েছে। তার ছাদে লম্বা বাঁশ বেঁধে কেন যে পতাকা টাঙানো তা কেউ জানে না। পতাকায় কোন রঙ নেই, কোন চিহ্ন নেই। সাদা কাপড়টা প্রতি বছর পাল্টানো হয়। বাংলা নাম ছিল বালিবাসা। কেউ কেউ বলত বালুবাসা। বালিই হোক

আর বালুই হোক, ট্যুরিস্ট আসার মুখ থেকেই ওটা চাপা পড়ে গেছে। স্যাণ্ডি নেস্ট বললে চট করে বুঝে যায় সবাই। পর্যটন বিভাগ তাদের বিজ্ঞাপনে তো বটেই সরকারী কাগজপত্রে স্যাণ্ডি নেস্ট নামটা চালু করার বিরোধী। তাঁরা বালিবাসাই বেছে নিয়েছেন। বালিবাসায় ভাল বাসা চাই? এই বিজ্ঞাপন দেখে ছুটে এসে লোকে বলছে স্যাণ্ডি নেস্ট। চারটে হোটেল ছাড়াও পর্যটন বিভাগের অতিথি নিবাস তৈরি হয়েছে এখানে। তিরিশ বছর আগে তিন মাইল দূরের ফারগঞ্জেই বাস থামতো, এ তল্লাটে আসতে হত হেঁটে, গরুর গাড়িতে। এখন বালিবাসায় বিরাট বাসস্ট্যাণ্ড হয়েছে, সকাল বিকেল চার গণ্ডা বাস ছাড়ছে, আসছে।

নৌকোটা কয়েকবার পাক খেল ঢেউ-এর ঘূর্ণিতে। সমস্ত শরীর ঘাম এবং নোনাজলে ভেজা। তেইশ বছরের পেশিগুলো টান টান। ফারগঞ্জের অনন্ত বিশ্বাস তাকে প্রাইজ দিয়েছিল গত বছর দু দুটো সাঁতারের প্যাণ্ট। বছরে একবার বালিবাসায় সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়। ভাঁটার সময় নৌকোয় চেপে প্রতিযোগীরা সমুদ্রের একশ গজ ভেতরে ঢুকে যায়। যদিও ঢেউ-এর নাচনে এক লাইনে নৌকো থাকে না তবে সেখান থেকেই লাফিয়ে পড়তে হয় জলে। উল্টো স্রোতে সাঁতার কেটে পর পর পাঁচ বছর প্রথম তীরে উঠে এসেছে ভদ্র। অনন্ত বিশ্বাসের দেওয়া সাঁতারের প্যাণ্ট দুটোর একটা তুলে রেখেছে ভদ্র, অন্যটা পরনে। সমস্ত শরীর তাই বাতাস এবং জলের স্পর্শ পায়। সে যখন নৌকো থেকে নামে তখন ট্যুরিস্টরা হাঁ করে ছাখে। পেটে যার সব সময় উনুন জ্বলে তার পায়ের গোছ, বুকের পাটা আর হাতের গুলি কি করে লোহার মতন হয় এই নিয়ে অনেকের গবেষণা।

তীর এগিয়ে আসছে দুলতে দুলতে। ব্রজকাকা এখন শান্ত মুখে বসে আছেন। বুক পিঠ এক হয়ে গেছে মানুষটার। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। পেটটা ঢুকে গেছে ভেতরে। কিন্তু সমুদ্র চেনে মানুষটা। জলে চোখ রেখে বলতে পারে কোথায় মাছ চরছে। সম্পর্কে বাপের সাক্ষাৎ ভাই।

সূর্যদেব জলের মায়া ছেড়েছেন। আকাশের রঙ বদল হয়েছে। লম্বা বিচের জায়গায় জায়গায় মানুষের জটলা। এরা ট্যুরিস্ট। সবাই সমুদ্র

দেখতে আসে কিন্তু সন্তর্পণে সমুদ্র এড়িয়ে কদিন বাস করে ফিরে যায় এ কেমন দেখা !

নৌকো থেকে নেমে পড়ে টানতে টানতে জল থেকে তুলে আনা মাত্র শহরে মানুষগুলো যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। রোজ যেমন হয় আজও ব্যতিক্রম নয়। সবাই মাছ দেখতে চাইছে। এবং সেই সঙ্গে মন্তব্য, 'কি ফিগার দেখেছিস। দারুণ।' ভদ্রদের এসব কথায় কান দেবার সময় নেই। ভিড় উপেক্ষা করে জালগুলো টানতে টানতে খানিকটা ওপরে উঠে আসতে হয় যেখানে ব্রজকাকার দ্বিতীয় পক্ষের বউ আর প্রথম পক্ষের মেয়েরা দাঁড়িয়ে চটপট হাত চালাতে শুরু করে তারা। এক এক জাতের মাছ এক এক জায়গায় রাখা, জালে উঠে আসা আবর্জনা অথবা অখাদ্য মাছ ছুঁড়ে ফেলার কাজ চলবে এখন। মানুষগুলো একটু দূরত্ব রেখে চক্রাকারে হাঁ হয়ে মাছ দেখছে। পাইকার এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে, 'বড় দেরি করে এলি ব্রজ, তোদের ফেলে যেতেও পারি না। কাল পাঁচ টাকা পাওনা ছিল, মনে আছে ?'

ভদ্র আর দাঁড়াল না। এখন এখানে তার কোন প্রয়োজন নেই। টাকার হিসেবটা ঘরে গিয়ে নিলেই চলবে। চারটে বাজলে চুল্লু খেতে যায় ব্রজকাকা। ফেরে সাতটায়। ঘুমোয় দুটো অবধি। ওই চারটের আগে টাকাটা চাইলেই হল।

সমুদ্রের গায়ে সকালের ভিড়টা থাকে দুটো পর্যন্ত। তারপর কিছুক্ষণ নিরিবিলি হয়ে আবার রোদ পড়তেই চারপাশ মেলাকার। খানিকটা হেঁটে একটু ফাঁকা জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ভদ্র। তার চওড়া পিঠ আর সরু কোমরে রোদ পড়তেই শুকনো বালি ফুটতে লাগল। চোখ বন্ধ করেও যেন সমস্ত শরীরে একটা দুলুনি বোধ করল সে।

বালিবাসায় পিচের রাস্তা হয়েছে কিছুকাল আগে। তবে সে রাস্তা সমুদ্র থেকে অনেকটা ভেতরে। নতুন হোটেলগুলো সমুদ্রের গায়ে নয়। বছর তিনেক আগেও মাটি খাচ্ছিল ঢেউ। দাপট বাড়লেই চিড় ধরছিল জমিতে। সরকার বাঁধ বেঁধেছে মাইলটাক। তার আর পাথরের সেই বাঁধ মেরামত করতে হয়েছে এ বছর। জলের ভয়ে নতুন হোটেল উঠেছে

অনেকটা ভেতরে। একমাত্র মাইকেল সাহেবেরটাই ব্যতিক্রম। জল উঠে এসেছিল প্রায় গায়ের ওপরে। তার পাথরের বাঁধ পড়ায় আপাতত রক্ষে। তবে চিড় ধরেনি কোথাও। তাই একমাত্র মাইকেল সাহেবই বলতে পারেন, 'কাম টু মাই স্যাণ্ডি নেস্ট অ্যাণ্ড লিভ অন সি।' কথাটা এমন চালু এখানে যে দু দুটো নতুন হোটেল নিজেদের নাম রেখেছে স্যাণ্ডি নেস্ট এবং লিভ অন সি। অথচ মাইকেল সাহেবের হোটেলের নাম ভালবাসা। হোটেলটির একটিমাত্র শর্ত ওখানে বসে মদ খাওয়া চলবে না। ফলে ফুর্তি খুঁজতে আসা যুবকদের দেখা পাওয়া যায় না সেখানে।

মাইকেল সাহেবের দাড়ি সাদা। চোখে নিকেলের গোল চশমা। গায়ের রঙ পুড়তে পুড়তে যেখানে এসে ঠেকেছে সেখানেও বিদেশী তকমা রয়ে গেছে। মাথায় সোলার গোল টুপি, পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি, একটা ঝকঝকে সাইকেল—এই হল মাইকেল সাহেব। সকালের খবর শেষ হতেই সাইকেল নিয়ে আজ বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। বাসস্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে হোটেল এলাকা পেরিয়ে যে ফাঁকা পথটা সমুদ্রে নেমে গেছে সেই-খানে পৌঁছে বৃদ্ধ বালির চরে চোখ বোলালেন। যে সমস্ত মানুষ মাছ ধরে অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল চরে, বিক্রি-বাটা শেষ করে তারা এখন ফিরে যাচ্ছিল। ওদেরই একজন বলল, 'নমস্কার সাহেব, আজ মাছ পান-নি ?'

'হ্যাঁ। সে তো সুধীর দিয়ে গিয়েছে। আমি খুঁজছি ভদ্রবাবুকে, সে কোথায় বলতে পারো।' মাইকেল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন। দ্বিতীয়জন উত্তর দিল, 'ব্রজর নৌকো তো এই ফিরেছে। হবেখন চরের কোথাও।'

মাইকেল সাহেব মাথা নেড়ে বাঁধ পেরিয়ে মাটির রাস্তা বেয়ে বালির চরে নেমে এলেন। তাঁকে রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দূর থেকে ভিড়-টাকে লক্ষ্য করে তিনি এগিয়ে গেলেন সাইকেলটাকে হাতে নিয়ে। মুখে বাতাস লাগছে, লম্বা দাড়ি উড়ছে। তিরিশ বছর আগে বালুবাসায় এসে যে নির্জনতা তিনি পেয়েছিলেন, অবহেলিত এই সমুদ্রতট তাঁকে যেভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, তিরিশ বছর পরে অনেক আধুনিকতার অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও ভাল'লাগাটা নষ্ট হয়ে যায় নি। সমুদ্রের দিকে তাকালে তাঁর কেবলই

মনে হয় মানুষ যাই করুক না কেন আকাশ আর সমুদ্রকে কোনমতেই নষ্ট করতে সক্ষম হল না। বুক ভরে সমুদ্রের বাতাস নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন।

ততক্ষণে দুটো মাঝারি ভেটকি মাছ নিজেদের জন্যে রেখে বাকি সব পাইকারের ঝুড়িতে তুলে দিয়ে ব্রজ টাকা গুনে নিচ্ছিলেন। আজ এক-টাও চিংড়ি জোটেনি কপালে। সবসমেত বিরানব্বুই, তা থেকে পাঁচ টাকা বাদ। পাইকার বলছিল, 'চিংড়ি ধরো হে ব্রজ, তোমার মুখ চেয়েই তো বসে আছি। অমন ভাইপো যার সঙ্গী সে যদি না ধরে তো অন্যদের দোষ কি!' ব্রজ বললেন, 'মাছ ধরতেই তো জলে নামি। কিন্তু শালার মাছগুলো আজকাল আরও গভীর জলে সাঁতরায় বোধ হয়। তবু তো আজ, ও ছোঁড়ার জন্যে কবে আমায় ডুবে মরতে হবে। দিকভ্রম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।'

ব্রজর বউ মেয়েরা তখন ভেটকি দুটো হাতে ধরে গল্প শুনছিল আর দর্শকদের বলছিল, 'আজ বিক্রির জন্যে মাছ নেই।' ব্রজর কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র বউ বলে উঠল, 'ও ছোঁড়াকে ত্যাগ কর তুমি। ভাইপো ভাইপো করে—।' জিভ দিয়ে বাকি শব্দের বদলে একটা শব্দ উচ্চারণ করল সে।

এই সময় মাইকেল সাহেবকে দেখতে পেয়ে পাইকার চাপা গলায় জিজ্ঞাসো করল, 'আরে, হোটেলসাহেব এখানে কেন? ওর কাছ থেকেও কি টাকা নিয়েছিলে ব্রজ?'

ব্রজকে জবাব দিতে হল না। তার আগে ভিড়টাকে সরিয়ে মাইকেল সাহেব মুখ বের করলেন, 'এই যে ব্রজ, তিনি কোথায়? আমাদের ভদ্দর চন্দর?'

ব্রজ মুখ তুলে তাকালেন। সকালবেলায় মাইকেল সাহেব ভাইপোর খবর নিচ্ছে কেন? মাছ চাই নাকি? সম্বল বলতে তো এখন দুটো ভেটকি। ব্রজ বললেন, 'জাল নামিয়ে চলে গেল ওইদিকে। কিছু দরকার আছে?'

'দরকার? আরে ওর নাম এইমাত্র রেডিওতে বলেছে। সেই শুনেই

তো ছুটে আসছি।'

ব্রজ হতভম্ব। পাইকার চলে যাচ্ছিল, কথাটা শুনে থমকে দাঁড়াল। মাইকেল সাহেব বললেন, 'কলকাতার তিনজন মানুষ আর বালিবাসার ভদ্র নৌকো চালিয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়ায়। রেডিওতে এই খবর দিয়ে বলল তিন দিনের মধ্যে ওরা বালিবাসায় আসছে। এটা আমাদের কত বড় গর্ব বুঝতে পারছ ? আনন্দে আমার বুক ভরে গেছে।'

'ভদ্দরকে ওরা তাহলে নিয়ে যাবে !' করুণ গলায় উচ্চারণ করলেন ব্রজ।

'ওরকম করে বলছ কেন ? দশগণ্ডা ছেলের মধ্যে ওরা ভদ্রকে বেছে নিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রথম যে দলটা এক্সপিডিশনে যাচ্ছে বালিবাসার ছেলে তার মধ্যে আছে। এ একটা খবরের মত খবর।' ব্রজর দেখানো দিকটা লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করলেন মাইকেল সাহেব। সাইকেলটাকে একহাতে ধরে। ব্রজ ফ্যাল ফ্যাল করে ওঁর যাওয়া দেখলেন। হঠাৎই যেন ওঁর হাঁটুতে ঝিঁঝিঁ ধরে গেল। ধীরে ধীরে উবু হয়ে বসে পড়লেন তিনি। ব্রজর বউ ছুটে এল পাশে। ঝুঁকে পড়ে কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল তোমার ?'

দু হাতে মাথা ধরে হাঁটু-মোড়া ব্রজ বললেন, 'সর্বনাশ !'

রোদের তেজ বেড়েছে। দূর থেকে শরীরটাকে দেখতে পেলেন মাইকেল সাহেব। সত্যি, স্বাস্থ্য বটে ছেলেটার। বালিবাসায় এমন শরীর আর কারও নেই। বেড়াতে আসা মানুষেরা এখন ফিরে যাচ্ছে নিজেদের ডেরায়। একটু বাদেই স্নানের মরশুম আরম্ভ হবে। আর এই সময় ছেলেটা উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে ? সাইকেল নিয়ে মাইকেল সাহেব ভদ্রর মাথার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জলজ বাতাস ছেলেটাকে নিশ্চয়ই জব্বর আরাম দিচ্ছে। এই অবস্থায় ওর ঘুম ভাঙাতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। তবু আনন্দটাকে চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। ঈষৎ ঝুঁকে কয়েকবার ওর নাম ধরে ডাকলেন।

লাল টকটকে চোখ, চিবুকে বালিসাঁটা, ভদ্র কোনরকমে মুখ তুলে

ওই অবস্থায় যখন তাকাল তখন তিনি মত পাল্টালেন, 'শোন, আজ দুপুরে আমার হোটেলে খাবি। শুনতে পাচ্ছিস? আমার হোটেলে খাবি। আমি চললাম।'

কয়েকবার মাথা নাড়ল ভদ্র। মাইকেল সাহেবের পা এবং সাইকেলের চাকা ঘুরতে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে বালিতে মুখ গুঁজল।

বড় রাস্তায় উঠতে গিয়ে ফারগঞ্জের অনন্ত বিশ্বাসকে হাত নাড়তে দেখলেন মাইকেল সাহেব। অনন্ত বিশ্বাস রিকশায়। ওঁকে দেখে নেমে এসে বললেন, 'আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে আমার ভাইপো চিঠি লিখেছে একটা স্যুটিং পার্টি আসছে দিন দশেকের জন্যে। স্টার আর ডিরেক্টার থাকবেন স্যাণ্ডি নেস্টে, আপনার ওখানে কয়েকজনকে জায়গা দিতে হবে।'

মাইকেল সাহেব মাথা নাড়লেন, 'বেশ তো। খাতা দেখে বলে দিচ্ছি, দিনটা বলুন।'

'চলুন।' অনন্ত বিশ্বাস খুশি মুখে বললেন।

'ওহো, খবরটা শুনেছেন?'

'কি খবর?'

'আমাদের ভদ্র সিলেকটেড হয়েছে।'

'অ্যাঁ? তাই নাকি?' অনন্ত বিশ্বাস চমকে উঠলেন, 'কি করে জানলেন?'

'রেডিওর খবরে বলল। ওরা কয়েকদিনের মধ্যে এসে যাবে এখানে। নিশ্চয়ই ভদ্রকে খবর পাঠাবে তার আগে। ভারী ভাল খবর।' মাইকেল সাহেব মাথা নাড়লেন।

'নিশ্চয়ই।' অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'ব্যাপারটা সবাইকে জানানো দরকার। সে ছোকরা কোথায়?'

'মাছ ধরতে গিয়েছিল। এখন বালিতে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে।'

মাইকেল সাহেবের হোটেলটি ছিমছাম। দিন-রাত সমুদ্রের গর্জন আর উত্তাল বাতাস ঘরে ঘরে যেন হামলা চালাচ্ছে। হোটেলটি থেকে যা লাভ হয় তার প্রায় পুরোটাই তিনি ফারগঞ্জের গীর্জাকে দিয়ে দেন। বস্তুত এই

তল্লাটে গীর্জা যা কিছু জনহিতকর কাজকর্ম করেছে তার পেছনে মাইকেল সাহেবের ভূমিকা কাজ করছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল বালিবাসা কেন ফারগঞ্জের কোন মানুষ মাইকেল সাহেবকে গীর্জার উপাসনায় যোগ দিতে ছাখেনি। রিকশা থেকে নেমে অনন্ত বিশ্বাস সেই কথাটাই ভাবছিলেন হোটেলটির দিকে তাকিয়ে। এখান থেকেই স্যাণ্ডি নেস্টের ঝাউবন শুরু হয়েছে। প্রথমে হোটেলটি ছিল একতলা বাংলো টাইপের। চাহিদা বাড়ার পর কাঠের দোতলা হয়েছে। এখানে যারা একবার চাকরিতে ঢোকে তারা মারা যাওয়ার আগে অন্যত্র যায় না। কর্মচারীদের বেশির ভাগের বয়স তাই পঞ্চাশের ওপরে। কারবারী মানুষ অনন্ত বিশ্বাসের ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হয় না। শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ হয় না এ কেমন ব্যাপার!

অফিসঘরটি ছিমছাম চমৎকার। চেয়ার টেনে নিয়ে অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'বালিবাসায় তো অনেক হোটেল হল কিন্তু এখানকার ইজ্জত আলাদা। আপনি শুনেছেন স্যাণ্ডি নেস্টে ক্যাসিনো বসছে। জুয়া খেলতে পারবেন ট্যুরিস্টরা। পুলিস অনুমতি দিচ্ছে।'

মাইকেল সাহেব রেজিস্টার টেনে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক দৃষ্টিকটু জুয়া নয়। যেমন ধরুন রাস্তাঘাটে দেখা যায় একটা লোক দেওয়ালে নানান বেলুন ঝুলিয়ে রেখে এয়ার রাইফেল ছুঁড়ে সেগুলোকে ফাটাতে বলে, সব ফাটাতে পারলে পুতুল কিংবা ওই ধরনের কিছু পুরস্কার দেয় এও সেইরকম। দু টাকার কয়েন ফেলে হাতল ঘোরালে যদি পাশাপাশি তিনটে একই নম্বর উঠে আসে তা হলে হোটেল কিছু প্রাইজ দেবে। এ ব্যাপারটা য়ুরোপের সব জায়গায় চালু। এরা তো নিজস্ব বার থেকে ড্রিঙ্কস সার্ভ করার লাইসেন্স পেয়েছে। অর্থবান সেই সব ট্যুরিস্টদের নিয়ে আমরা কেন দুশ্চিন্তা করছি। হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন, দিন দশেকের মধ্যে দুটো ঘর খালি হবে। চারখানা বেড। কিন্তু অনন্তবাবু, স্যুটিং পার্টির লোকদের বলে দেবেন এই হোটেলের নিয়ম মেনে চলতে।'

অনন্ত বিশ্বাস মাথা নাড়লেন, 'সেটা আমি জানি। কিন্তু দুটো ঘরে চারজনের বেশি কি থাকতে দেওয়া অসম্ভব হবে? বুঝতেই পারছেন—।'

'সেটা যাঁরা থাকবেন তাঁদের আচরণের ওপর নির্ভর করছে।'

'বাঃ! চমৎকার! তা হলে ওই কথাই রইল। ও হ্যাঁ, একটা কথা অনেকদিন থেকেই মাথায় পাক খায়, আজ জিজ্ঞাসা করে ফেলি।' অনন্ত বিশ্বাস থামলেন।

স্মিত মুখে মাইকেল সাহেব বললেন, 'বলুন।'

'শুনেছি আপনি বিয়ে-থা করেননি। কখনও দেশে বেড়াতে গিয়েছেন বলেও তো শুনিনি। এই হোটেলের ব্যবসা, মানে আপনি না থাকলে এ-সব কে দেখবে?' কথাটা বলতে অনন্ত বিশ্বাসের বেশ অস্বস্তি হল। মাই-কেল সাহেব চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর হাত দাড়িতে দুবার নামা-ওঠা করল। তিনি মাথা নাড়লেন, 'যাদের জিনিস তারাই দেখবে। আপনি জানেন না, এই হোটেল আমার নয়। আমি দেখাশুনা করি মাত্র। যে পাঁচজন কর্মচারী গোড়া থেকে এখানে কাজ করছে মালিকানা তাদের নামেই।'

আঁতকে উঠলো অনন্ত বিশ্বাস, 'কি বলছেন আপনি?'

'ঘটনা এটাই। তবে দুটো শর্ত আছে। কখনও কেউ নিজের অংশ বিক্রী করতে পারবে না। আর লাভের অর্ধাংশ চার্চ কিংবা কোন জন-হিতকর সংস্থায় দান করতে হবে। এরা কেউ মারা গেলে এদের আত্মীয়রা যাতে অসুবিধে সৃষ্টি করতে না পারে তাই এ ব্যবস্থা।'

অনন্ত বিশ্বাস যখন রিকশায় উঠলেন তখনও তাঁর বোধ সক্রিয় হচ্ছিল না। এরকম ব্যবস্থার কথা তিনি জীবনে শোনেননি। নিজের ব্যবসা কর্ম-চারীদের নামে লিখে দিয়ে কেউ কখনও ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পারে? এতক্ষণে স্পষ্ট হল কেন কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে চলে যায় না। এই হোটেলে কখনও শ্রমিক মালিক আন্দোলন হবে না। যেসব রাজ-নৈতিক দল মালিকদের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা এখানে কি করবে? এই সব ভাবতে ভাবতেই অনন্ত বিশ্বাসের বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা সৃষ্টি হল। তিনি নিজেও ব্যবসায়ী। মাছ, কাজুবাদাম থেকে শুরু করে এখন কন্ট্রাক্টরিতে প্রচুর পয়সা করেছেন তিনি। তাঁর ব্যবসায় নিত্য শ্রমিক বিক্ষোভ লেগেই ছিল। সক্রিয় রাজনৈতিক দলের মদত ম্যানেজ করে

তিনি সেসব চেপে দিয়েছেন। মাইকেল সাহেবের ব্যবস্থা যতই সাধু হোক ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। পকেটে রাখা বুকের ট্যাবলেট কৌটো থেকে বের করে জিভের তলায় রাখলেন অনন্ত বিশ্বাস। তিনি সাধু নন। নিয়মিত সন্ধ্যায় মদ্যপান করেন, কিছুদিন আগেও অন্যান্য আমোদে আসক্ত ছিলেন। মাইকেল সাহেবের তুলনায় তিনি অনেক বেশি রক্তমাংসের মানুষ। নিঃশ্বাস ফেললেন অনন্ত বিশ্বাস। এবং তখনই তাঁর ভদ্রর কথা মনে পড়ে গেল। ছোকরাকে তাঁর ব্যবসার কাজে দরকার ছিল। এই সমুদ্র পার হবার সুযোগটা এসে যাওয়ায় ভালই হল। ওকে আরও বিখ্যাত করতে হবে। স্যাণ্ডি নেস্ট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকে রিকশা ঘোরাতে বললেন তিনি।

প্রসারিত হাতে উঠে আসা ঢেউ ফেনা জড়িয়ে দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ভদ্র। চোখ মেলে দেখল দ্বিতীয় ঢেউটা ঠিক আগের জায়গায় এসে ফিরে গেল। এখন ভর দুপুর। সূর্য মাথার ওপরে। এপাশে ওপাশে স্নানার্থীদের ভিড়। ঘুম তখনও ভদ্রর শরীরে জড়ানো। মাথাটা দুবার ঝাঁকিয়ে সে সামনে তাকাল। ছেলেবেলায় দু কান চাপা দিয়ে ওরা রাবণের চিতা জ্বলার শব্দ শুনতো। আর এখানে এসে দাঁড়ালেই মনে হত লক্ষ বাসুকি ফণা নাড়ছে। এখনও মাঝে মাঝে ওই চেহারা দেখে মনে হয় আর বেশি দেরি নেই, কোন এক মাঝরাতে এই দেড় মাইল লম্বা বালিবাসাকে টপাস করে গিলে নেবে ও। ছেলেবেলায় আর একটা গল্প শুনতে পেত সে। এই সমুদ্র, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তার তলায় নাকি জ্বলছে বিশাল উনুন। যেভাবে ভাত ফোটে, দুধ উথলে ওঠে সেইভাবে ওই জল জ্বলছে। শুধু বরুণদেব কৃপা করেন বলেই মাঝে মাঝে আকাশ থেকে বৃষ্টি আর হাওয়া নেমে আসে আর তাতেই জলে জ্বলুনি এলেও উত্তাপ থাকে না। শিশু ভদ্র ভাবতো সে কেমন উনুন যা ফোটায় কিন্তু দগ্ধ করে না!

উত্তরটা এখন যেন আভাসে ইঙ্গিতে টের পায় সে। কিন্তু গুছিয়ে বলার মত ভাষা তার নেই। হাঁটু মুড়ে কিছুটা দূরে সরে বসল ভদ্র। সমুদ্রের যেখানে কেউ যেতে সাহস পায় না সেখানে সে অবলীলায় ঘোরে।

মাইকেল সাহেব একবার বলেছিলেন, যত ভেতরে যাবে তত শান্ত হয়ে থাকতে দেখবে সমুদ্রকে। সেই চেহারাটা দেখার বড় ইচ্ছে ভদ্রর। এই সময় তার আবছা মনে পড়ল, মাইকেল সাহেব কি তাকে হোটেলে যেতে বলেছেন? সে ঠিক ঠাওর করতে পারছিল না।

আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে দুটি বাবু এবং একটি বিবি বালিবাসায় এসে ঘোষণা করেছিল তারা ওই বিশাল সমুদ্রটাকে পালতোলা নৌকোয় ডিঙিয়ে যেতে চায় তখন সবাই অবাক হয়েছিল। অনেকে হেসে ফেলেছিল কথাটা শুনে। তারপর ওরা যখন বলল সমুদ্র চেনে এমন একজনকে ওরা চার নম্বর সদস্য করতে চায় তখন মাইকেল সাহেব এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি সবাইকে ডেকে ডেকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। বাবু-বিবিরা ঘোষণা করেছিল চতুর্থ জনকে দিনে পঞ্চাশ টাকা হারে মজুরি দেওয়া হবে তখন কিন্তু ভিড়টা বাড়তে লাগল। সবাই ধরে নিল শহুরে বাবুদের এটা একটা খেয়াল। তিন-চার দিন সমুদ্র ঘুরে ফিরে আসবে ওরা। এই সুযোগে যদি কিছু টাকা কামিয়ে নেওয়া যায় মন্দ কি। মাইকেল সাহেবের পরামর্শে বাবুবিবিরা প্রতিদিন মাঝরাতে মাছ ধরা নৌকোয় উঠে ওদের সঙ্গে সমুদ্রে যেত। ওরা মাছ ধরত না কিন্তু যুবকদের কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখত আর মাইকেল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করত হোটেলে ফিরে। ওরা চলে যাওয়ার সময় কিছু বলে যায়নি। শুধু জানা গিয়েছিল ওদের যাত্রা শেষ হবে অস্ট্রেলিয়া নামের একটা দেশে। ওরকম কোন দেশ আছে সমুদ্রের ওপারে এমন কথা বালিবাসার অনেকেই জানত না। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারমশাইরা অবশ্য বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব। হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া খুব সুন্দর দেশ, সেখানে প্রচুর পরিমাণে শস্য হয়, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং সোনার খনি আছে কিন্তু সেখানে নৌকো করে পৌঁছনোর চিন্তা পাগলেও করবে না। কত মাস লেগে যাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কথাটা সবার কানে কানে বাজলো। বড়লোক শহুরে মানুষেরা না হয় শখে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে। কিন্তু বালিবাসার ছেলেরা কেন সে ফাঁদে পড়বে? টাকার জন্যে? পঞ্চাশ টাকা আবার টাকা নাকি! ধীরে ধীরে উত্তেজনাটা একসময়

থিতিয়ে গেল।

কথাটা ভদ্র জানে। বালিবাসায় যত ট্যুরিস্ট আসছে তত টাকা রোজ গারের ধান্দা বাড়ছে। তবে ওই পনের কি পঁচিশ তার বেশি নয়। তোমার যদি টান-টান পেশি থাকে, মনে যদি খাটার ইচ্ছে না মরে তা হলে তুমি এখানে না খেয়ে মরবে না। আর কিছু না হোক সমুদ্র আছে। যদিও সমুদ্রের কিনারায় মাছেরা আজকাল সব সময় আসতে চাইছে না কিন্তু ঢেউ ভেঙে ভেঙে মাঝরাতে সবাইকে টপকে আরও ভেতরে ঢুকে গেলে মাছেদের দেখা না পাওয়ার কোন কারণ নেই। বালিবাসায় প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর যেই আসুক সমুদ্র ভদ্রকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না। কিন্তু সব দিয়ে থুয়ে কত? কপাল ঠিক থাকলে বড়জোর ভাগে পড়বে পঁচিশ। তিন বাবুবিবি বলে গেল পঞ্চাশ। কম কি? এই বাসুকির ফণা বল আর ফুটন্ত কড়াই বল, ডিঙোতে হবে পঞ্চাশ টাকা রোজে। ঘরে ঘরে নানা রব পড়ে গিয়েছিল বাবুবিবিরা চলে যাওয়ার পর। সব মরশুমে জালে মাছ ওঠে না, সব মাসে সমুদ্রে নৌকা নামানো যায় না, জমানো টাকায় সারা বছর পেট ভরে চলে না, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা রোজের লোভে আত্মহত্যা করার কোন মানে হয় না। ভূগোল মাস্টার বলেছেন, আত্ম-হত্যা ছাড়া আর কি? বর্ষায় মাছ ধরতে গিয়েই গতবার দুজন আর ফেরে-নি। তারা গিয়েছিল কাছেপিঠেই। আর এই পাগলামিটা চলবে মাসের পর মাস। সেখানে মানুষের দেখা নেই, প্রকৃতি কারো চাকর হয়ে কথা শুনবে না। টাইফুন নামে যে ঝড়টা ওঠে সেটা মাঝ সমুদ্রেই উঠতে পছন্দ করে। তাও যদি টিকে থাকা যায় তো জলের অভাবেই প্রাণ বেরোবে। কত জল আর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে ওরা।

এসব শোনার পর বালিবাসা ফারগঞ্জের কোন যুবকের মনে পঞ্চাশ টাকার ধান্দাটা আর নেই। কিন্তু টাকাপয়সা নয়, সমুদ্রের ধারে এলেই ভদ্রকে টালমাটাল করে একটা শব্দ, অস্ট্রেলিয়া। এই জল, যার কোন শেষ নেই বলে সে জানতো তার ওপাশে একটা স্বপ্নের দেশ রয়েছে যার নাম অস্ট্রেলিয়া। যেখানে পৌঁছতে গেলে লক্ষ লক্ষ ঢেউ পার হতে হবে, হরেক রকমের সমুদ্রের চেহারা দেখতে হবে, আর এসব ভাবলেই শিরায়

শিরায় রোমাঞ্চ বয়ে যেত।

পিছুটান বলতে মা। সেই মা খেপে গেল একদিন। হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'লজ্জা লাগে না তোর? মরণের খুব শখ, না? খবরদার বলছি। ওসব মতলব ঝেড়ে ফেল মাথা থেকে। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। বাসন্তীর মায়ের কাছে যাচ্ছি। সামনের লগ্নেই বিয়ের ব্যবস্থা যদি না করি তো আমার নামে—।' প্রতিজ্ঞাটার শেষ অবশ্য কখনও উচ্চারণ করে না মা। বাসন্তীর সঙ্গে তার কোনকালেই প্রেমট্রেম নেই। বাপ একসময় আগ বাড়িয়ে বলেছিল বাসন্তী বড় হলে বউ করে ঘরে আনবে। কথাটাকে এখন জপের মালা করে নিয়েছে মা। পনের বছর আগের কথাটাকে কিছুতেই বাসি হতে দেয়নি।

মাকে আর এসব ইচ্ছের কথা জানায়নি। দিনরাত শীতলপাটি বানিয়ে মায়ের রোজগার দিনে বিশ টাকা। মা ছেলের সংসারে তাই আরাম ছড়িয়ে। মায়ের স্বপ্নের সঙ্গে তার স্বপ্ন মেলে না এই যা ফারাক। বারো বছর আগে মায়ের যখন মাত্র আটাশ বছর বয়স তখন বাপের নৌকো মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরেনি। দুদিন-তিনদিন খুব খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। গবর্মেণ্ট থেকে লঞ্চ ছুটোছুটি করেছিল একূল ওকূল। না নৌকো না মানুষ, কারো হদিশ মেলেনি। সে রাতে মেঘ ছিল, ঝড়ের ভয়ে বেশি নৌকো বের হয়নি। যারা ফিরে এসেছিল তারা কেউ কিছু দ্যাখেওনি। নৌকোয় বাপের সঙ্গী ছিল গগনকাকা, বাসন্তীর বাপ। দুজনেই উধাও হয়ে গেল চিরদিনের মত। তিন দিন ধরে এই বিচে পড়েছিল মা। কাঁদতে কাঁদতে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল তবু ওঠেনি। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকত আর অভিশাপ দিত। এগার বছর বয়েসের ভদ্র খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সেই মাকে দেখে চিনতে পারত না সে সময়। আত্মীয়-স্বজনরা যখন মাকে তুলে আনতে পারল তখন মায়ের জ্ঞান নেই। সেই থেকে বারো বছর মা সমুদ্রের মুখদর্শন করেনি। এত কাছাকাছি থেকেও ভুলেও এদিকে পা বাড়ায়নি। ব্রজকাকা যখন বছর পাঁচেক আগে মায়ের কাছে গেল ভদ্রকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার অনুমতি চাইতে, তখন মা বলেছিল, 'স্বামী হারিয়েছি, ছেলেকেও কেড়ে নিতে চাও ঠাকুরপো?'

ব্রজকাকা কিছুক্ষণ থম ধরে ছিলেন। তারপর বললেন, 'এটা আমাদের
াত ব্যবসা। দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে হাত গুটিয়ে নিলে পিতৃপুরুষের মান
াকবে?'

'মান ধুয়ে তোমরা জল খাও, আমার কি।' মা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

'তা ছাড়া তোমার ওপর চাপ পড়ছে। ছেলেটার রোজগারের ধান্দাও
তা করতে হবে। আমি তোমাকে দুটো কথা দিতে পারি। আকাশে মেঘ
াকলে কখনও নৌকো বের করব না আর নাগালের বাইরের জলে
নৌকো নেব না। আমি রোগে ভুগছি। ভাড়া করা লোক দিয়ে মাছ
রা যায় না। আমার মুখ চেয়ে তুমি না বলো না। দাদা বেঁচে থাকলে
কখনও অসম্মত হতো না।' শেষের দিকে ব্রজকাকা প্রায় কাকুতি-মিনতি
করতে লাগলেন। মা শেষ কথা বলেছিলেন, 'যে যাবে তার মত নাও।
এরপর আর আমার কি বলার আছে!'

তিন বাবুবিবি সমুদ্র ডিঙিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে। কলকাতার খবরের
কাগজে ছবি আর খবর ছাপা হয়েছিল। দুই বাবু আর এক বিবির ছবি।
ুস্তর পারাবার পার হতে চলেছে তিন দুরন্ত যৌবন, এই রকম কিছু লেখা
ছিল বড় বড় অক্ষরে। কিন্তু কোথাও বলা ছিল না ওই বাবুবিবিরা বালি-
াসার কাউকে পঞ্চাশ টাকা রোজে ভাড়া করবেন। ভূগোলের মাস্টার
লেছিলেন, হয়তো এখানকার কাউকে ওদের পছন্দ হয়নি অযোগ্য বলে।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল ভদ্র। বাবুবিবিরা যেখানে থাকে সেই
কলকাতার ধারেকাছে নাকি সমুদ্র নেই। গঙ্গা নদীর জলে আর পুকুরে
স্নান করে সবাই। তা ওরা সমুদ্র চিনে গেল আর বালিবাসার এত মানুষ
ারা জন্ম থেকে সমুদ্র ঘাঁটছে তাদের যোগ্যতা নেই বলে? বেশ হতাশ
য়ে পড়েছিল সে। অথচ আশা করার মত কিছু ছিল না। কেউ তাকে
লেনি যে নির্বাচিত করা হবে। কিন্তু জলে নামলেই ভদ্রর মনে হত বালি-
াসার কেউ যদি নির্বাচিত হয় তাহলে সে-ই হবে। মাঝে দুদিন সে মাই-
কেল সাহেবের কাছে গিয়ে জেনেছিল বাবুবিবিরা ফিরে গিয়ে মাত্র একটি
চিঠি লিখেছে। তারা তৈরি হচ্ছে। যাত্রার অন্তত মাসখানেক আগে আর
একবার এসে সব ঠিক করে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ায় কারা থাকে ? ভূগোল মাস্টারের দৌলতে তাও জানা হয়ে গিয়েছে এই বালিবাসার একটা চায়ের দোকানের ছোঁড়ারও। বিলেত নয় আমেরিকা নয় কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মানুষেরা সাদা চামড়ার, ইংরেজি বলে। একটা বিরাট দেশকে নিজের করে নিয়েছে ওই মানুষগুলো বিলেত থেকে এসেই। সে-দেশের আদি বাসিন্দারা সংখ্যায় এত অল্প যে, তারাও ধীরে ধীরে এদের সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন বেঁচে গেছে। এখনও পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যত জমি তত মানুষ নেই। দেশটা যে প্রায় স্বপ্নের মত সুন্দর তা ভাবতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না ভদ্রের। সমুদ্রের কাছে এলেই বুকের মধ্যে উত্তেজনাটা বুদবুদ তোলে। যে সময় বাবুবিবিরা এসে-ছিল বালিবাসায় সে-সময় মায়ের অবস্থা হয়েছিল শ্রাবণের খড়ের চালের চেয়েও খারাপ। কথা বন্ধ, একা থাকলেই ফুঁপিয়ে কাঁদে। আর সমুদ্রের নামে গালাগাল দেয়। একদিন দুপুরের ঘুম সেরে উঠছে ভদ্র, মা একে-বারে মা-কালীর মত সামনে এসে দাঁড়াল, 'আমাকে ছুঁয়ে তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে ওই শয়তানদের সঙ্গে দেখা করবি না। প্রতিজ্ঞা কর নইলে আমি গলায় দড়ি দেব।'

ভদ্র অনেকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মায়ের জেদ ভাঙানো সম্ভব হয়নি। মায়েয় ধারণা বাপে খেদানো মায়ে খেদানো ওই তিনজন তাকে নিঃস্ব করতে এসেছে। ভদ্র হো হো করে হেসেছিল, 'তুমি ভাবছ কি করে ওরা আমাকেই নেবে !'

'আমি জানি নেবে। ভগবান আমাকে ছিবড়ে না করে ছাড়বে না।'

'তুমি কি করতে বলছ আমাকে ?'

'আমাকে ছুঁয়ে বল ওরা যতদিন এখানে থাকবে ততদিন ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবি না।' সেদিন প্রতিজ্ঞা না করে নিষ্কৃতি পায়নি ভদ্র। কথা রাখতে হয়েছিল তাকে। ব্রজকাকাকে বলে দিয়েছিল দিনতিনেক সে সমুদ্রে যাবে না মাছ ধরতে শরীর খারাপ হওয়ায়। তিন নয়, চারদিন পরে বাবুবিবিরা শহরে ফিরে যাওয়ার খবর পেয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল ভদ্র। প্রতি মুহূর্তে সে কাঁটা হয়ে থাকত এই বুঝি অন্য কেউ নির্বাচিত হয়ে যায়। বেরিয়ে যখন জানতে পারল ওরা কাউকে নির্বাচিত করে যায়-

নি তখন বুক খুশিতে ভরে গিয়েছিল। বুকের মধ্যে বিশ্বাসটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠল, বালিবাসা থেকে কেউ যদি ডাক পায় তবে সেই পাবে।

মৃত্যুর কথা কিছুতেই মানতে ইচ্ছে করে না। প্রতিটি মানুষ একসময় চেহারা পাল্টে পাল্টে মরে যায়, তাই বলে জীবনযাত্রা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! এই সব যুক্তি মায়ের মাথায় ঢুকবে না। আজ পর্যন্ত ঝড়ের দাপটে দিক হারিয়ে ভেসে যায়নি সে কিন্তু তাই বলে কোনদিন যাবে না কে বলতে পারে? এক রাতের জন্যে সমুদ্রে হামাগুড়ি দেওয়া মা মেনে নিয়েছে। কিন্তু তার বেশি মানবে না। এক রাত্তিরে যেন কম ভয়ের ব্যাপার ঘটতে পারে। পঞ্চাশ টাকা নয়, যে জল যে ঢেউ যে সমুদ্রের কথা সে জানে না সেখানে যাওয়ার নেশা লেগে গেছে মনে।

নরম বালিতে আবার শরীর বিছিয়ে চুপচাপ শুয়ে আরামটাকে সর্বাঙ্গে অনুভব করছিল সে। ত্ব'হাতের জোড়ে চিবুক রেখে বালির সমান্তরালে চোখ এনে সমুদ্রতট দেখছিল। বালির ওপরে চলন্ত স্নানার্থীদের পিঁপড়ের মত মনে হচ্ছে। ঢেউগুলো যেন পাহাড়। হঠাৎ ভদ্রর মনে হল একই দৃশ্য ওপর-নিচ থেকে দেখলে চেহারা পাল্টে যায়, অচেনা ঠেকে।

দ্রুত হাত চলছিল। আঙুলগুলো থলথলে চর্বিওয়ালা শরীরে হার্মোনিয়ামের রিড টেপার মত ছুটোছুটি করছিল। মানুষটির শরীরে খাটো খাকি প্যান্ট, উর্ধ্বাঙ্গে ডোরাকাটা গেঞ্জি। শরীর দড়ি-পাকানো। তার পাশে বালির ওপরে কাঠের বাক্সে পাঁচ রকমের তেলের সঙ্গে ক্রিম এবং পাউডার রয়েছে। একটি পরিষ্কার তোয়ালে ওদের সঙ্গী। যার শরীরে দলাইমলাই চলছিল তার ত্ব'চোখ বুজে এসেছে। দূর থেকে দেখলে ছাল-ছাড়ানো শুয়োরের সেঁকা মাংসের মত মনে হচ্ছিল। মানুষটির একটু ওপাশে গগলস-চোখে একজন মহিলা ওয়াকম্যান কানে নিয়ে বিভোর হয়ে শরীর এলিয়ে বসে আছেন। দেখেই বোঝা যায় মহিলার স্নান করার কোন বাসনা নেই। শেষদিকে আঙুলগুলো দ্রুততর হল। সইয়ে সইয়ে আঘাত হওয়ায় এখন শব্দ জোরে বাজলেও আধা ঘুমন্ত মানুষটির সম্ভবত কোন কষ্ট হচ্ছিল না। ম্যাসেজ যখন বন্ধ হল তখন লোকটির মুখে ঘাম।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছে বাক্সের পাশে বসে সে নিঃশ্বাস ফেলল। কখনই খদ্দেরের সামনে সে ওই তোয়ালে ব্যবহার করে না। বৃহৎ মানুষটি এখন ঘুমাচ্ছে। অনেক অনেক পরিশ্রম করে ম্যাসেজ করা শিখতে হয়েছে তাকে। স্নানের আগে শুধু তৈলমর্দক নয়, কোথায় কত--খানি চাপ দিলে ঘুম আসে, যন্ত্রণা দূর হয়, কোন নার্ভে কতখানি আঘাত করলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হবে অথবা মেদবৃদ্ধিরোধ করে শরীরকে তরতাজা রাখতে কি করা উচিত তা তার মস্তিষ্কে ঠাসা। মুখ তুলে আকাশ দেখল সে। এখনও অন্তত গোটা তিনেক খদ্দের পাওয়ার সময় আছে। শর্টকাট করলে চারটে। শর্টকাট, অর্ডিনারি আর স্পেশাল। যে যেমন চাইবে সে তেমন পাবে। তবে রোগা রায়ের হাতে যে একবার শরীর দিয়েছে সে ঘুরেফিরে আসবেই। বালিবাসায় তার ফি বছরের বাঁধা ক্লায়েণ্ট আছে। প্রতি বছর গরমের সময় এমন কয়েকজন কলকাতা থেকে এখানে আসে দিন সাতেকের জন্যে। তখন নিঃশ্বাস ফেলারও সময় থাকে না রোগা রায়ের। গরমের সময় তো সকাল দুপুর বিকেল, আঙুল বাজালেই পয়সা। চার কন্যার তিনটিকে তো এই করে পার করেছে সে। শেষটি বিদায় হলে শরীর ঘাঁটা ছেড়ে একটা পান বিড়ির দোকান দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে রোগা রায়।

লোকটা বেশ ঘুমোচ্ছে। উপুড় হয়ে শুলেও যাদের নাক ডাকে, চিৎ হলে তো তারা বাঘ হয়ে যাবে। এখন টাকা না দিলে তো ওঠা যাচ্ছে না। এদিকে সময়ও বয়ে যাচ্ছে। রোগা রায় উঠে মেমসাহেবের সামনে গিয়ে হাসল, 'কমপ্লিট ম্যাডাম।'

মেমসাহেব ওয়াকম্যানের আংটা কান থেকে খুলে সাহেবের দিকে তাকাল। তাঁর ঠোঁটের কোণে বিরক্তি ফুটে উঠল। একটু দ্বিধা দেখিয়ে দুই আঙুলের আলতো চাপে ব্যাগের মুখ খুললেন তিনি, 'হাউ মাচ?'

'স্পেশাল রেট। ফিফটিন।' হাত পাতল রোগা রায়।

একটা কুড়ি টাকার নোট সেখানে ফেলে দিলেন মেমসাহেব। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা শুকিয়ে ফেলল রোগা রায়, 'নো চেঞ্জ ম্যাডাম।'

মেমসাহেব কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে সোজা

চলে গেলেন হোটেলের দিকে সাহেবকে ফেলে। রোগা রায় হাসল। সে জানতো কথাটা বললে তাকে পাঁচটা টাকা ফেরত দিতে হবে না। মেম-সাহেবদের চেহারা দেখলেই সে বলে দিতে পারে কার মেজাজ কি রকম হবে। সাহেবের দিকে আর একবার তাকিয়ে সে হাঁটতে লাগল। ঠিক তখনই একটা চিৎকার ভেসে এল। চারপাশে স্নানার্থীদের ভিড়। স্নানের আগে শরীর ম্যাসেজ করে নিতে চায় অনেকে। উর্দিপরা ছোকরা তত-ক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, 'অ্যাই রোগা, জলদি চল।'

রোগা রায় উৎফুল্ল হল। স্যাণ্ডি নেস্টে তার ডাক পড়ে কদাচিৎই। অবশ্য ওখানে ঢুকতেই তার বুক টিপটিপ করে। হোটেলের রিসেপশন থেকে বলে দেওয়া হয়েছে সে যেন কখনওই না ডাক পেলে হোটেল চত্বরে ঘুরঘুর করে। অবশ্য ডাক আসে কালেভদ্রে। এবং ওই হোটেলের নির্দেশেই সে পোশাক পাল্টেছে। এই পরিষ্কার ঝকঝকে গেঞ্জি প্যান্ট পরা আরম্ভ করেছে। স্যাণ্ডি নেস্টের বোর্ডাররা নোংরা দিশি মানুষকে সহ্য করতে পারবে না। রোগা রায় চট করে নিজের দিকে তাকিয়ে নিল। মুখটা মুছে সে উর্দিপরা লোকটার সঙ্গে হাঁটতে লাগল। এবং তখনই তার নজরে পড়ল রোদ্দুরে বালিতে মুখ গুঁজে ভদ্র শুয়ে আছে। ছেলে-টার শরীর দেখে তার আবার মনে হল, ওকে একদিন ম্যাসেজ করতে পারলে ভাল হত। যাদের সে আঙুলে পায় তাদের শরীর ভদ্রর ধারে-কাছে নয়। কিন্তু ছোঁড়া তার ফি দেবে কোত্থেকে ?

গেট পেরিয়ে রোগা রায় থমকে দাঁড়াল। এক দুই করে গাড়ির সংখ্যা শেষ করতে পারল না গুনে। আজ স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলে বেশ ভিড় জমেছে। গেটেও দারোয়ান ছিল, মূল দরজায় আরও দুজন। যে লোকটি ডেকে এনেছিল সে তাড়া লাগালে রোগা রায় পা চালাল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগল। স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলটার সব জায়গা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। বাঁ দিকের রিসেপসনে তখন দুজন কাজ করছে। বয়স্ক লোকটি তাকে দেখে হাত নাড়ল। রোগা রায় অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে সামনে দাঁড়াতেই রিসেপশনিস্ট বললেন, 'কোথায় থাকো হে তুমি ? ইস ! গেঞ্জিতে কি লাগিয়েছ ?'

'অয়েল স্যার। ফ্রেস কোকোনাট অয়েল।'

'তোমাকে বলেছিলাম এখানে যখন আসবে পরিষ্কার হয়ে আসবে। কি করা যায়!' ভদ্রলোককে খুব চিন্তিত দেখাল। রোগা রায় বলতে যাচ্ছিল সে কি করে জানবে যে আজই তার এখানে ডাক পড়বে। রিসেপশনিস্ট টেলিফোনে কারো সঙ্গে কথা বলে সঙ্গীর দিকে তাকালেন, 'ম্যানেজমেন্টকে বলতেই হবে হোটেলে একজন রেগুলার ম্যাসেজম্যান রাখা দরকার।' তারপর কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে রোগা রায়কে ইঙ্গিত করলেন পেছনে আসতে। বালিবাসায় এমন মাথা ঘোরানো হোটেল হবে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। নিচে তুটো খাবার জায়গা। ওপরে ওঠার লিফট আছে যেটাকে নিজে টিপে চালাতে হয়। নিচের বিরাট হলঘরের মধ্যে লাল নীল জলের ফোয়ারা চোখ টানছে। ফোয়ারার ওপাশে গোটা চারেক রঙিন মেশিন। সেখানে সুবেশ পুরুষ-মহিলারা হৈ হৈ করছেন। এর আগে সে তুদিন এখানে এসে কাজ করেছে। এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক তাকে সি-বিচে ম্যাসেজ করতে দেখে ডেকে পাঠিয়েছিল। রিসেপশনিস্ট একটা সাদা অ্যাপ্রন গলায় বাঁধতে বললেন। রোগা রায় দেখল সেটা বাঁধার পর হাঁটু পর্যন্ত আড়ালে পড়ে গেল। লিফট নয়, সিঁড়ি ভেঙে ওকে নিয়ে দোতলায় উঠে এসে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শোন, কথাবার্তা ব্যবহার খুব ভদ্রভাবে করবে যাতে গেস্ট খুশি হয়। তোমার জন্যে যদি এই হোটেলের বদনাম হয়ে যায় তাহলে আমি খুব মশকিলে পড়ব। মনে থাকে যেন।' রোগা রায় পুতুলের মত মাথা নাড়তেই তিনি দরজায় শব্দ করলেন। কয়েক মুহূর্ত। দরজা খুলতে রোগা রায় অবাক। এই মেমসাহেবকেই সে একটু আগে সমুদ্রের ধারে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকতে দেখেছিল গগল্‌স্ চোখে। ইনিই তার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ফেরত না নিয়ে চলে এসেছিলেন। ততক্ষণে রিসেপশনিস্ট বলছেন, 'স্যরি ম্যাডাম। আমাদের যে ম্যাসেজ করে তার একটা অ্যাকসিডেন্ট হওয়াতে খুব প্রবলেম হয়ে গিয়েছে। এ অবশ্য খুব ভাল কাজ করে, মানে আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট প্রশংসা করেছেন। আপনার আপত্তি না থাকলে একে দিয়ে একবার ট্রাই করতে পারেন।'

মহিলার ঠোঁট ছুটো সামান্য ছুঁচলো হল। যেন কিছু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'সি-বিচে হোটেল করতে হলে একজনকে সবসময় রাখতে হয়। ওয়েল—।' হাতের মুদ্রায় তিনি রোগা রায়কে ভেতরে ঢুকতে বললেন। রিসেপশনিস্ট যাওয়ার আগে আরও খানিকটা ভদ্রতা করে গেল। নরম কার্পেটে পা ডুবে যাওয়ামাত্র রোগা রায়ের শরীরে কম্পন এল। আজ অবধি কখনও তার খদ্দের কোন মহিলা হয়নি। তাছাড়া এমন মোমের মত শরীর যার সে তাকে দিয়ে ম্যাসেজ করাবে এটা ভাবতেই গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। মেমসাহেব তাকে নিয়ে গেলেন ব্যাল-কনিতে। সেখানে রোদ নেই কিন্তু সামুদ্রিক হাওয়া আছে। ট্রানজিস্টারে বিদেশী বাজনা বাজছে। একটা নয়, অনেকগুলো ঘর নিয়ে মেমসাহেব এখানে আছেন। সাহেব, যিনি হয়তো এখনও বালিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন, তিনি যদি এঁর স্বামী হন তাহলে নির্বাচনটা সঠিক হয়নি। বাক্স হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রোগা রায় এই সব ভেবে যাচ্ছিল। মেমসাহেবের গলা কানে যাওয়ায় চমক ভাঙল। রিসেপশনিস্টের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে-ছিলেন তিনি। এখন হিন্দিতে বললেন, 'বাক্সটা ওখানে রেখে বাথরুমের বেসিনে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এস।' বিন্দুমাত্র দেরি না করে রোগা রায় নির্দেশ মান্য করল।

বেরিয়ে এসে দেখল ব্যালকনিতে ছোট বেতের টেবিলে ছু রকমের ক্রিম এবং পাউডার রাখা হয়েছে। এসব জিনিস সে স্বপ্নেও ছাখেনি। কিন্তু তখনই তার অস্বস্তি বেড়ে গেল। অন্যের অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? তার বাক্সে যেসব তেল রয়েছে সেগুলো সে নিজের হাতে তৈরি করে। কতখানি শরীরের কোন্‌খানে কতটা ঘষলে কি প্রতি-ক্রিয়া হবে সেটা তার ভাল জানা আছে। এই ক্রিম যতই দামী হোক যদি সেইরকম কাজ না দেয়!

এই সময় মেমসাহেব একটা আলখাল্লা পরে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। তারপর সহজ বাংলায় বললেন, 'আমার বাঁ হাঁটুতে সামান্য ব্যথা আছে। ডান দিক দিয়ে চাপ দেবেন না। কয়েকদিন ম্যাসাজ না হওয়ায় হিপের কাছে অস্বস্তি হচ্ছে। ক্লিনিক থেকে বলেছিল ওখানে

ক্লকওয়াইজ ম্যাসাজ করাতে। আপনি তো ঘুম এনে দিতে পারেন, তাই তো ?'

রোগা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ মেমসাব।'

'কিন্তু এই দিনেদুপুরে ঘুম চাই না আমি। অনেক কষ্টে ফ্যাট তাড়িয়েছি শরীর থেকে। আর কি কি করতে পার তুমি ?' মেমসাহেব আলখাল্লা খুলে ব্যালকনির মেঝেতে পাতা একটা মোটা গদিতে শুয়ে পড়তেই ফিগারের প্রশংসা করল সে। পেশি-টেশি নেই। কিন্তু শরীরের যেখানে যা থাকা উচিত সেখানে তাই রয়েছে। মোমের মত শরীরের বাঁক-গুলো চমৎকার। চর্বিসর্বস্ব অথবা হাড়-জিরজিরে শরীরে ম্যাসেজ করে করে রোগা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তা মেমসাহেবকে এই অবস্থায় দেখে বেশি করে অনুভব করল। সে বলল, 'ঘুম ছাড়া আমি আর একটা কাজ করতে পারি। আপনার সমস্ত শরীরে কোন উত্তেজনা থাকবে না। মনে হবে ঠাণ্ডা জলের তলায় শুয়ে আছেন আরামে।'

মেমসাহেব পুলকিত হলেন, 'ইজ ইট ? বাঃ তাই করো।'

'কিন্তু মেমসাহেব, এইগুলো নিশ্চয়ই খুব দামী, খুব ভাল জিনিস, কিন্তু আপনি যদি আমার তেল ব্যবহার করার—।' রোগা রায়ের কথা শেষ হল না। মেমসাহেব হাত তুলে ওকে থামিয়ে বললেন, 'ওই গন্ধ আমি সহ্য করতে পারব না। ইউ আর টু ওয়ার্ক উইদ দিজ।'

কার্পেটের চেয়ে নরম শরীরে হাত রেখে মনে মনে এঁচে নিল। মেম-সাহেবের নজর একবার যে এর মধ্যে রোগা রায়কে পরখ করে নিয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু প্রাথমিক অস্বস্তিটা কাটিয়ে উঠল অল্প সময়ের মধ্যেই, রোগা রায়ের আঙুল চলতে লাগল যেভাবে ওস্তাদ সেতারী সুরে বাঁধা যন্ত্র হাতে পেলে সহজাত দক্ষতা প্রকাশ করে। গুরু বলেছিল, রোগা, শরীর হল সবচেয়ে দামী যন্ত্র। ঈশ্বর সেই যন্ত্র বাজান। কিন্তু সুরের যন্ত্র খারাপ হলে যেমন কিছু মানুষ তা সারিয়ে দেয় অথচ লোকে তাদের শিল্পী বলে না, আমরা হয়েছি সেই জাতের। মানুষের শরীরে যখনই হাত দেবে তখনই মন নির্লিপ্ত করে ফেলবে। তোমার কাজ শুধু সুর বেঁধে দেওয়া।

তিনবার হাত বাড়িয়ে ক্রিম নিয়েছিল সে। এর পরে হুঁশ থাকল না। অভ্যেসে নিজের তেলের শিশিতে হাত পড়ল। মেমসাহেব চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন। দুটোর পার্থক্য সম্ভবত টের পাননি। শরীরটাকে উল্টে দেওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ রোগা রায়ের কানে স্যাণ্ডি নেস্ট শব্দ দুটো ঢুকে পড়ল। বাজনা বন্ধ হয়ে রেডিওতে তখন খবর হচ্ছে ইংরেজিতে। তারপরেই রোগা রায় সোজা হয়ে বসল। ওরা কি ভদ্রর নামটা উচ্চারণ করল ?

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াটিস রঙ ? হাত থামালে কেন ?'

'মেমসাব, রেডিওতে কি বলল এখন ?'

'রেডিওতে ? ওহো ! সাম সর্ট অফ এক্সপেডিশন। ক্রেজি পিপল। ওঃ ! ওরা নৌকো করে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। বিখ্যাত হবার জন্যে আজকাল কত না কায়দা বেরিয়েছে !'

'অস্ট্রেলিয়া ? স্যাণ্ডি নেস্টের নাম বলল, ভদ্দরটারও।' প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল রোগা রায়।

'স্যাণ্ডি নেস্ট ? ওহো ! দিস প্লেস ! হ্যাঁ, তাই বলল। বাট হু ইজ দিস ভদ্র ! রেডিওতে বলল, লোকাল রিক্রুট। এ যাচ্ছে কেন ?'

'ভদ্দর ? মেমসাব, ভদ্দর হল আমাদের বালিবাসার বেস্ট সুইমার। দারুণ নৌকো চালায়। ওর মত ফিগার এখানে কারো নেই।' রোগা রায়কে অত্যন্ত গর্বিত মনে হচ্ছিল। মেমসাহেব তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সম্ভবত আনন্দিত হওয়ায় রোগা রায়ের হাত বাকি কাজটা শেষ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে ও এখানে ?'

'মাছ ধরে। মিড নাইটে মিড সমুদ্রে চলে যায়। কেউ না পাক ও পাবেই। কিন্তু ওর কাকা ওকে ছাড়বে কিনা সন্দেহ। ভদ্দর চলে গেলে নো ইনকাম !'

'আই সি ! তাহলে যাচ্ছে কেন ?'

'ফিফটি রুপিজ ইনকাম হবে ওর প্রত্যেকদিন। কিন্তু সেই টাকা তো ওর কাকা পাবে না। আমি জানতাম বালিবাসা থেকে কেউ চান্স পেলে

ভদ্দরই পাবে।' তোয়ালে দিয়ে সযত্নে মেমসাহেবের শরীরের তেল মুছিয়ে দিচ্ছিল রোগা রায়। সেই সময় তার মনে হল খবরটা পেয়ে একটা গোলমাল হয়ে গেল। ছোট মেয়েটার সঙ্গে ভদ্দরের সম্বন্ধ করার কথা কিছুদিন ধরে মাথায় পাক খাচ্ছিল। ছোঁড়াটা সমুদ্র থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কথাটা না বলাই ভাল।

ঠিক বারোটায় বালিবাসায় কলকাতার বাস পৌঁছে যায়। সেই বাসে যাত্রীদের জন্যে যেমন বিভিন্ন ছোট হোটেলের দালালরা জড়ো হয় তেমনি খবরের কাগজের জন্যে কিছু মানুষ অপেক্ষা করেন। চিঠিপত্র অবশ্য এই বাসে আসে না। রেডিওর খবরটা এর মধ্যেই বালিবাসার বাবুদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভদ্রকে নির্বাচন করা হয়েছে, তার নাম রেডিওতে বলা হয়েছে, এই সংবাদ ফুলে ফেঁপে এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে। যে যেমন পারছে গল্প বানাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে বি বি সি নাকি খবরটা প্রচার করে জানিয়েছে তাঁরা তাঁদের ক্যামেরা নিয়ে বালিবাসায় আসছেন। আসল খবরটার জন্যে যাঁরা বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের মধ্যে মাইকেল সাহেবও আছেন। যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর বাসের মাথা থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কাগজের বাণ্ডিল নামানো হলে কেউ কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চিৎকার করে প্রথম পাতার নিচের দিকে ছাপা খবর পড়ল একজন, 'সাগর পাড়ি। গত কয়েকমাস নিবিড় প্রস্তুতির পর অভিযাত্রীরা এবার প্রস্তুত। পালতোলা নৌকোয় তাঁরা পাড়ি জমাবেন দীর্ঘ সমুদ্রপথ। স্যাণ্ডি নেস্ট অথবা বালিবাসার সমুদ্রে তাঁরা নৌকো ভাসিয়ে পৌঁছবেন অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন শহরে। বঙ্গোপসাগর ডিঙিয়ে আন্দামান দ্বীপকে ডান দিকে ও বর্মাকে বাঁ দিকে রেখে ওঁরা এগোবেন যতক্ষণ আন্দামান সমুদ্রে না পড়েন। এবার তাঁদের ডান দিকে পড়বে নিকোবর দ্বীপ বাঁ দিকে থাইল্যাণ্ড। সেই অংশ পার হবার পর জাভা সমুদ্রে পৌঁছতে মালাক্কা প্রণালীতে প্রবেশ করতে হবে। সুমাত্রা, জাভা, বালিকে ডান দিকে আর মালয়েশিয়া বোর্নিও লামোবককে বাঁ দিকে রেখে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে ওঁরা অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন শহরে ঠিক কতদিন পরে

পৌঁছাবেন তার আগাম হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়। এশীয় মহাদেশ থেকে এত দীর্ঘ জলপথ এর আগে কেউ নৌকোয় পার হওয়ার চেষ্টাই করেননি। অভিযাত্রীরা বলেন ডিউক এবং পিনাকীর অভিযানের গল্পই তাঁদের প্রেরণা জুগিয়েছে। এই যাত্রায় মৃত্যু যেকোন মুহূর্তেই তাঁদের ওপর থাবা বসাতে পারে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এই নবযৌবন দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিযাত্রী দলের নেতা সুদীপ মুখার্জির সঙ্গী মানব মিত্র এবং তিস্তা সেন। এঁরা তিনজনেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। একজন মহিলা হিসেবে তিস্তা যে অসীম সাহসিকতার নিদর্শন রাখতে চলেছেন তাতে বঙ্গীয় নারীসমাজ গর্ব প্রকাশ করেছে। অভিযাত্রীদের গড় বয়স বাইশ। এঁরা রওনা হচ্ছেন আগামী শনিবার।'

যে লোকটি খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিল, পড়া শেষ হওয়ামাত্র সে ফ্যাল ফ্যাল করে কাগজটার দিকে তাকাল। শ্রোতাদের একজন চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের ভদ্দরের নামটা পড়লে না কেন হে?' পাঠক মাথা নাড়ল, 'এখানে ছাপা না হলে পড়ব কি করে! ভদ্দরের নাম ওরা লেখেনি।'

সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর খবরটা নিয়ে সমালোচনা শুরু হল। এখানে যারা উপস্থিত তাদের মধ্যে একমাত্র মাইকেল সাহেব ছাড়া কেউ খবরটা নিজের কানে শোনেনি। মাইকেল সাহেব ততক্ষণে একপাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন অভ্যস্ত একটি ইংরেজি দৈনিকে দ্রুত নজর বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত খবরটায় চোখ পড়ল তাঁর। খুব সংক্ষেপে যাত্রার দিন, জলপথ জানিয়ে লিখেছে তিন অভিযাত্রী সুদীপ মুখার্জী মানব মিত্র এবং তিস্তা সেনের সঙ্গী হিসেবে ভদ্র দাস নামে স্যাণ্ডি নেস্টের স্থানীয় যুবক যোগ দিচ্ছেন। খবরটা দুবার পড়ে মাইকেল সাহেব চিৎকার করে উঠলেন। ততক্ষণে জমায়েত হালকা হয়ে এসেছিল। খবরটা ভুয়ো এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সবাই। মাইকেল সাহেব প্রত্যেককে ডেকে ডেকে ইংরেজি খবরটা শোনাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মত পাল্টে গেল সবার। কেউ কেউ বলল, বাংলা কাগজের দুধে এত জল যে খবর ভেসে যায় আবেগে। আর ইংরেজি কাগজে একেবারে খবরের ক্ষীরটুকু জমানো থাকে। এই

নিয়েই যখন তর্ক চলছে তখন মাইকেল সাহেব সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সুবোধ মাইতির বিরাট গুদাম ঘরে অন্তত তিরিশজন বিভিন্ন বয়সের মেয়ে সকাল নটা থেকে পাঁচটা হাত চালায়। গুদাম ঘর বলা হয় কারণ ওপরে টিনের ছাদ, দেওয়ালগুলো টিনের। দেড়শ ফুট লম্বা ঘরটায় কোন দেওয়াল নেই। মাইতি মশাই সর্বত্র বলে থাকেন নারী জাতির প্রগতির জন্যে তিনি এই সামান্য সংস্থাটিকে সৃষ্টি করেছেন। সংস্থার কাজ হল পাটি তৈরি করা। নানান শ্রেণীর সেই পাটি শুধু বাইরের জেলাগুলোতেই চালান যায় না, এখন স্যাণ্ডি নেস্টের সমুদ্রতটেও বিক্রি হয়। চাঁছা থেকে রঙ করা, বিভিন্ন স্তরের কাজের জন্যে আলাদা বিভাগ রয়েছে। মাসকাবারী মাইনেতে কেউ নেই এখানে, হপ্তায় রোজের হিসেবে টাকা পায় সবাই। যার যেমন কাজ তার তেমন রোজগার। বস্তুত বালিবাসার মেয়েদের প্রথম চাকরির সংস্থান করেছেন মাইতি মশাই। ফলে মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে জিততে এবং পরে চেয়ারম্যান হতে তাঁর অসুবিধে হয়নি কিছু।

সকাল এগারটা পর্যন্ত সুবোধ মাইতি এই ব্যবসাটি দেখাশোনা করেন এছাড়া তাঁর নিজস্ব জোতজমি এবং একটি যাত্রীবাহী বাস আছে। বেলা বারোটা থেকে তিনি মিউনিসিপ্যাল অফিসে বসে চেয়ারম্যানি করেন। মুখে বলেন, সেবাই তাঁর জীবন। কু-লোকে অবশ্য অন্য কথা বলে। অনন্ত বিশ্বাসকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে আজ অবশ্য বিশেষ পুলকিত হলেন না সুবোধ মাইতি। অনন্ত ফারগঞ্জের লোক। এককালে বালিবাসায় কেউ বড় একটা আসতো না। দোকানপাট হাটবাজার জমিয়ে বসত ফারগঞ্জে। সমুদ্রতট উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হবার পর বালিবাসা যেই স্যাণ্ডি নেস্ট নামে প্রচারিত হল তখনই অবস্থা পাল্টালো। এখন ফারগঞ্জকে কে চেনে? স্যাণ্ডি নেস্টের নাম কলকাতার কাগজে ছাপা হয়। মন্ত্রীরা মাঝে মাঝেই ছুটি কাটাতে আসছেন। ট্যুরিস্টমন্ত্রী গতবার বলে গেছেন আগামীবার বাজেটে স্যাণ্ডি নেস্টের জন্যে বেশি টাকা বরাদ্দ করা হবে। আর এসব হবার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে অনন্ত বিশ্বাস এখানে

ান ঘন যাতায়াত করছেন। সাঁতার প্রতিযোগিতায় দুটো জাঙিয়া দান করতে খরচ সামান্য কিন্তু ওটা ওঁর মাথায় আসায় নামটি কিনে ফেললেন।

স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলে আজ অবধি দুবার ঢুকেছেন সুবোধ মাইতি। কে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। হোটেলের মালিকের সমস্ত ভারতবর্ষে গোটা ানের ফাইভ-স্টার হোটেল আছে। কোন তোয়াক্কা না করলেও যখন লে তখন তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সুবোধ মাইতিকে লেছিলেন, 'আপনার আশ্রয়ে আমরা থাকব। একটু দেখাশোনা করবেন। খন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার হবে তখনই এখানে চলে আসবেন।' কিন্তু সুবোধ মাইতি যাননি। প্রথমত, ওখানে তাঁর বেশ অস্বস্তি হয়, দ্বিতীয়ত না যাওয়ায় সাধারণ মানুষকে তিনি দেখাতে পারছেন শহুরে বড়লোকদের া ঘেঁষে চলার পাত্র তিনি নন। স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেল সম্পর্কে বালিবাসার রিব মানুষের এক ধরনের ঔৎসুক্য এবং তা থেকে উদ্ভূত ঈর্ষার খবর াখেন তিনি। কিন্তু অনন্ত বিশ্বাস প্রায়ই রাত কাটায় স্যাণ্ডি নেস্ট হাটেলের উল্টো দিকে তৈরি ঝকমকে হোটেল অন দি সি-তে। হোটেলের াঞ্জাবী মালিকের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক তা কিছুতেই আবিষ্কার করতে ারছেন না তিনি। যে রাজনৈতিক দলের হয়ে সুবোধ মাইতি নির্বাচনে াড়েছেন সেই দলেরই সক্রিয় সদস্য হিসেবে অনন্ত বিশ্বাস এতকাল ফারগঞ্জে াঠি ঘোরাতেন। যেহেতু স্যাণ্ডি নেস্ট এখন তরতর করে উন্নত হচ্ছে তাই অনন্তর নজর এখন এই দিকে। লোকটাকে দেখলেই সুবোধ াইতির প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়।

পেছনে গুদাম, সামনে অফিসঘর। জানলা দিয়ে অনন্ত বিশ্বাসকে রিক্সা থেকে নামতে দেখেছিলেন তিনি, দরজা খুলে আসতে দেখে সহাস্যে লে উঠলেন, 'আরে কি সৌভাগ্য, আসুন, আসুন।' অফিসঘরের রজাটি ঠেলে খুলে যায়, ছেড়ে দিলে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। অনন্ত বিশ্বাস দুটো হাত যুক্ত করে বললেন, 'নমস্কার চেয়ারম্যান সাহেব। আপনার কাজে হয়তো ব্যাঘাত ঘটালাম কিন্তু না এসেও পারলাম না।'

'কি আশ্চর্য! দরিদ্রের কুটিরে পা দিয়েছেন এ তো—।' সুবোধ মাইতি

বেল বাজাতে লাগলেন বেয়ারাকে ডাকার জন্যে। অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না।'

'তা বললে হয়! একটু চা হোক।' হন্তদন্ত হয়ে আসা বেয়ারাটিকে নির্দেশ দিতেই অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'স্যাণ্ডি নেস্টের চেয়ারম্যান যদি নিজেকে দরিদ্র বলে পরিচয় দেন তবে বলতেই হবে তাঁর মত বিনয়ী খুব কম আছে।'

'কি যে বলেন। আমি জনতার সেবক। আর আমার জনতা হল গরিব কৃষক, জেলে, মজুর। এদের নিয়েই তো আমি আছি।' হাসলেন সুবোধ মাইতি।

'ঠিক কথা। কিন্তু আপনার এখানে একটি উজ্জ্বল রত্ন আছে। যার জন্যে আজ এই জেলা গর্ব করতে পারে।' অনন্ত বিশ্বাস বললেন।

'বুঝলাম না।' ধন্দে পড়লেন সুবোধ মাইতি।

'আমি ভদ্রের কথা বলছি।'

'ভদ্র? ও, সেই জেলে ছোকরা। ওকে খামোখা রত্ন বলছেন কেন?'

অনন্ত বিশ্বাসের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'আপনি কিছু শোনেননি?'

'না তো। কি হয়েছে?' সুবোধ মাইতির প্রশ্নটাকে অপছন্দ হল। বালিবাসা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েও তিনি কিছু জানেন না এটা ভাবতেই খারাপ লাগে।

'যে অভিযাত্রী দল বালিবাসা থেকে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে ভদ্র সেই দলে নির্বাচিত হয়েছে। ভেবে দেখুন, সমস্ত ভারতবর্ষের চারজন মানুষ এই সম্মান পাচ্ছে, আমাদের ভদ্র তাদের একজন। এটা এখানকার সমস্ত মানুষের অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার।' অনন্ত বিশ্বাস শেষের দিকটায় সত্যি সত্যি আবেগে বলে ফেললেন।

'খবরটা পেলেন কোত্থেকে?' সুবোধ মাইতি বুঝতে পারছিলেন না তার আনন্দিত না দুঃখিত হওয়া উচিত! ব্যাপারটায় কতখানি পাবলিক সেন্টিমেণ্ট আছে তা দেখতে হবে।

'মাইকেল সাহেব বললেন। উনি রেডিওতে শুনেছেন।'

চা এসে গেল। এই চায়ে মোটেই আগ্রহ নেই অনন্ত বিশ্বাসের।

তবু নিলেন। সুবোধ মাইতির মনে পড়ল কয়েক মাস আগে তিনটি যুবক যুবতী তাঁর কাছে এসেছিল। মেয়েটার পরনে টাইট প্যান্ট ছিল, ওপরে গেঞ্জি। গত কয়েক বছরে এই সব মেয়েকে তিনি প্রচুর দেখেছেন এখানে। কয়েকটি হিপিহিপিনী একবার বিচ-এর বাঁ দিকে একটু নির্জনে উলঙ্গ হয়ে রোদ পুইয়েছিল। তা নিয়ে কি হৈ চৈ। মেয়েছেলে দেখার আর কোন বাসনা তাঁর নেই। অনন্ত বিশ্বাস যে এখনও ঘোমটার তলায় খ্যামটা নাচছেন সে খবর তিনি জানেন। যা হোক, তিনজন এসে পরিকল্পনার কথা বলেছিল। চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে এখানে যেসব সাহায্যের দরকার তা পেতে সুবিধে হবে। তখনই তারা বলেছিল, চতুর্থ সদস্য হিসেবে স্থানীয় একটি ছেলেকে তারা পেতে চায়। সমুদ্র চেনে, পরিশ্রমী এবং মিশুক কোন ছেলের কথা তাঁর জানা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভেবেচিন্তে তিন-চারজনের নাম বলেছিলেন। তাদের মধ্যে নিজের ছেলের নামও ছিল। পরে ছেলে জানতে পেরে প্রচণ্ড চেঁচামেচি করেছিল, 'তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? অস্ট্রেলিয়ায় খামোকা নৌকো করে যাব কেন? পাঠাতে চাও তো প্লেন ভাড়া দাও।'

তা এসব কথা সুবোধ মাইতি ভুলেই গিয়েছিলেন। অনন্ত বিশ্বাসের কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে চিন্তার কথা। ওরা তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করেনি। তিনি বললেন, 'অনন্তবাবু, এসব অভিযান বেসরকারী ব্যাপার। মতলব কি তা তো জানি না।'

'চীফ মিনিস্টার যদি বিদায় জানাতে আসেন তখন কি বলবেন?'

'ওঃ তাই নাকি! এরকম ব্যাপার!' ঘাবড়ে গেলে এখনও বেফাঁস কথা বলে ফেলেন সুবোধ মাইতি, অভিব্যক্তি লুকোতে পারেন না। তার পরেই তাঁর মনে পড়ল সরলাবালার কথা। ভদ্দরের বাপ সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই এখানে কাজ করছে সে। ছেলে যে সাগরে যাচ্ছে তা জানে বলে মনে হয় না। তিনি বেল বাজিয়ে পিওনকে কারখানা থেকে সরলাবালাকে ডেকে আনতে বললেন। অনন্ত বিশ্বাস লোকটিকে লক্ষ্য করছিল। এই খবরটা মাইতি মশাই ভাল মনে নিতে পারছেন না

কেন ? যখন বালিবাসা ছিল তখন না হয় চলে যেত কিন্তু স্যাণ্ডি নেস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে এই অশিক্ষিতটাকে মানায় না। পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার। ফারগঞ্জ থেকে কিছু করা যাবে না। স্যাণ্ডি নেস্ট ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্ট চালু হবার পর তিনি কিছুটা জমি কিনে রেখেছিলেন। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সও দিয়ে থাকেন। এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে পাবলিক আগামীবার তাঁকেই চেয়ারম্যান হিসেবে চাইবে।

এই সময় একটি যুবতী নারী দরজা ঠেলে সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে ঘোমটা টেনে দাঁড়াল। গায়ে ঠিক থান নয় কিন্তু তারই কাছাকাছি সাদা কাপড় জড়ানো সত্ত্বেও অনন্ত বিশ্বাসের মনে হল এ নারীর যৌবনে ভাঁটা আসেনি। যদিও আজকালকার যুবতীরা সেমিজ পরে না শাড়ির তলায়, এ পরেছে। কৃচ্ছ্রসাধনের চেষ্টা সর্বত্র কিন্তু তা শরীরে চেপে বসেনি। সুবোধ মাইতি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ছেলে এখন কোথায় সরলা ?'

সরলাবালা এতক্ষণ খুব চিন্তায় ছিল। মাইতিবাবুর অফিসঘরে তার কখনই ডাক পড়ে না। এখানে মেয়েরা কাজ করে একটা নিশ্চিন্তি নিয়ে যে মালিকের চরিত্রে কোন দোষ নেই। সম্প্রতি সেটা অবশ্য মালিকের ছেলের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে কিন্তু সে-সব সমস্যা অল্পবয়সী মেয়েদের। প্রশ্নটা শুনে থতমত হয়ে গেল সরলাবালা, 'মাছ ধরে এসে বালিতে শুয়ে আছে।'

'কে বলল তোমাকে ? তুমি গিয়েছিলে ?'

'না। বাসন্তী বলল। কেন কিছু হয়েছে নাকি ?' আশঙ্কিত হয়ে উঠল সরলাবালা।

'হ্যাঁ। তোমার ছেলে বিখ্যাত হয়েছে। আজ রেডিওতে বলেছে তিনি সমুদ্র পেরিয়ে একটা কাঠের নৌকোর দাঁড় বেয়ে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়া এখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। জাহাজেই বোধহয় ছ মাস লেগে যায়, নৌকোয় লাগবে ছ বছর। তাও যদি পৌঁছতে পারে। দুটো শহুরে ছোঁড়া আর একটা মেয়ে মরতে চাইছে সমুদ্রে, কেন

সে তোমাকে কিছু বলেনি? তুমি জান না?' সুবোধ মাইতি বলতে বলতে লক্ষ্য করলেন সরলাবালার মুখে চোখে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বদলে কথা শেষ হওয়ামাত্র সে তীরের মত ছুটে বেরিয়ে গেল।

সুবোধ মাইতি হেসে বললেন, 'বীর জননীর প্রতিক্রিয়া দেখলেন তো!'

হতভম্ব হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শুনছিলেন অনন্ত বিশ্বাস, এখন উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনি, আপনি ইচ্ছে করে ওই মহিলাকে উত্তেজিত করলেন। কোথায় এই ধরনের উদ্যমকে সমর্থন জানাবেন না বানচাল যাতে হয় তার চেষ্টা করছেন।'

সুবোধ মাইতি হাসলেন, 'অনন্তবাবু, আমি একটি জীবন এবং পরিবারকে বাঁচাতে চাই। আমার বালিবাসার একটি পরিবারের জীবন ওসব উদ্যমের চেয়ে অনেক মূল্যবান।'

সমস্ত শরীর জ্বলছে সরলাবালার। যেন সমস্ত রক্ত শরীরে উঠে এসেছে। গুদামঘরে ঢুকে তার সহযোগিনীকে কোনমতে বলল, 'তুই হাত চালা, আমি আসছি। আজ আমি হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ছি না।' কোনওরকম প্রশ্ন আসার আগেই সে প্রায় দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সরলাবালা কিছুতেই চিন্তা করতে পারছিল না ভদ্দর তাকে এইভাবে উপেক্ষা করবে। অতবার নিষেধ করা সত্ত্বেও গোপনে সমুদ্রে যাওয়ার পরিকল্পনা নেবে! এত সাহস? সরলাবালার মনে হচ্ছিল তার শরীরে কেউ পেট্রল ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দিয়েছে। যৌবনের সবটাই যার মুখ চেয়ে গর্তে লুকিয়ে কাটাল সে এই প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছে? ওর বাপ কোনওদিন সংসারের দিকে তাকায়নি। তাকালে সেই রাত্রে মেঘ দেখেও নৌকো বের করত না। সমুদ্র তার সমস্ত গিলবার জন্যে যেন সব সময় লকলক করছে। বাপের রক্ত এবার ডাক দিয়েছে ছেলেকে। মরবার জন্যে ছটফট করছে। পায়ের তলায় যতক্ষণ বালি ততক্ষণ জল আমার চাকর, ওটা সরে গেলে তুমি তার গোলাম। সেই গোলাম হবার ভারী শখ

ছেলের। এখন একবারও ভাবল না মরে গেলে মায়ের কী হবে? সরলা-বালা দৌড়চ্ছিল কোনওদিকে না তাকিয়ে। সে ভুলে গেল সমুদ্রের মুখ-দর্শন না করার প্রতিজ্ঞা। ফলে ঢেউ-এর গর্জনও তার কানে ঢুকল না। সে বালির চরে নেমে তন্নতন্ন করে চারপাশ খুঁজতে লাগল। যেখানেই কাউকে শুয়ে থাকতে দেখছে দূর থেকে তার কাছেই ছুটে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কোমরে হাত দিয়ে যখন হাঁপাতে লাগল তখন সূর্যদেব মধ্যগগনে। বালির চরে ভদ্দর নেই।

বাসন্তীর কথাটা না শুনে একবার বাড়ি ঘুরে তবে এখানে আসা উচিত ছিল। পিছু ফেরার আগে সমুদ্রের দিকে তাকাল সে। জল উঠে এসেছে অনেকটা। আহা, ঢেউগুলোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! আশ্চর্য! সরলাবালা এখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষিপ্ত হতে পারল না। কিন্তু তার মাইতিমশাই-এর কথা মনে পড়ল। সেই শহুরে ছোঁড়াছুঁড়ি কোথায়? বাসন্তীর মুখে সে শুনেছে মেয়েটা প্যান্ট পরে, ছেলেদের মত চুল ছাঁটা। কেউ কেউ তাকে সিগারেট খেতে দেখেছে। সেই মেয়ে মন মজাল নাকি ছেলের! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

বাড়ির পথ ধরেছিল সরলাবালা। এখন বেশ ক্লান্ত লাগছিল। বড় রাস্তায় পড়ামাত্র একজন বৃদ্ধ তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাথার ছাতা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'তুমি ভদ্দরের মা, তাই তো? বাঃ! তোমার ছেলে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে গো। এমন ছেলে গর্ভে ধরেছ তুমি মা, বড় ভাগ্যবতী।' কথাগুলো বলে বৃদ্ধ চলে গেলেন। সরলাবালা তো হতভম্ব। এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে কয়েকবার। ঠিক পরিচয় জানে না। মনে মনে নিজেকে ভেংচি কাটল সরলাবালা, ভাগ্যবতী! এই তো ভাগ্যের নমুনা। যৌবনে স্বামীকে হারিয়েছে, এখন একমাত্র ছেলে মরতে বসেছে। আর একটু এগিয়ে রাস্তা ছোট করার জন্যে সে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতেই দু-তিনজন মানুষ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কোন কিছু আলোচনা করতে করতে আসছিলেন। দূর থেকে সরলাবালাকে দেখে একে অপরকে কিছু বলতেই একজন, একটু প্রবীণ বললেন, 'আপনি খবরটা পেয়েছেন? আমরা এইমাত্র খবরের কাগজ দেখে আসছি

মামাদের ভদ্দরের নাম ছাপা হয়েছে। সত্যি বলতে কি খুব গর্ব হচ্ছে। এই প্রথম বালিবাসার কারো নাম পেপারে ছাপা হল।'

সরলাবালা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, আপনার ছেলে কি খবরটা শুনেছে?'

সরলাবালা ঘাড় নাড়ল, নেড়ে বলল, 'জানি না।'

'সে কি!' উদ্বিগ্ন হল তৃতীয়জন, 'শুনলাম মাছ ধরে ফিরেছে। গেল কোথায়?'

'আমি তাকেই খুঁজছি।' সরলাবালা যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। হলটা কি! রাজ্যের লোক গায়ে পড়ে তাকে তাদের আনন্দের কথা জানাতে আরম্ভ করল কেন? আনন্দ তো হবেই। পরের ঘরে আগুন লাগলে প্রতিবেশীর তো আনন্দ হয়ই। সরলাবালা দ্রুত পা চালাল। পাড়ায় ঢুকতেই একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটে এল, 'পিসি, তোমার বাড়ির সামনে মেলা বসেছে।'

'মেলা?' থমকে দাঁড়াল সে, 'কি যা-তা বলছিস?'

'যাও, গিয়ে দ্যাখো। সবাই বসে আছে তোমাদের জন্যে।'

ভদ্দরের বাপ মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। আত্মীয়স্বজন তো দূরের কথা, পাড়াপ্রতিবেশী জমিয়ে আড্ডা মারতে আসে। বাড়ির সামনে এসে সরলাবালা তো কি করবে ভেবেই পাচ্ছিল না। অন্তত জনা পনেরো বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওকে দেখতে পেয়ে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই তো, এসে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টা ওকে কেন্দ্র করে বৃত্তের মত ছড়িয়ে পড়ল। সরলাবালা দেখল রোগা রায় সবাইকে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, নমস্কার! নিজের কানে শুনে এলাম। আমার একটা খুব বড় ক্লায়েন্ট এসে উঠেছে স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলে। তার ঘরেই কাজ করতে করতে রেডিওতে শুনলাম।'

হারান, পাশের বাড়ির ছেলে, বলল, 'বাংলা খবরে বলেছে।'

'দূর। এ খোদ দিল্লি থেকে ইংরেজি খবরে বলেছে। প্রাইম মিনিস্টার মানে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত খবরটা শুনেছে। আমাদের ভদ্দর এখন

ভারতবিখ্যাত।' রোগা রায় নাটকীয় গলায় শেষ করল, 'আর শুনে সব বিজনেস ফেলে না ছুটে এসে পারলাম না।'

সরলাবালা বলল, 'কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কিসের?' উপিনকাকা গলা তুললেন, 'ভদ্দর আমাদের ঘরের ছেলে। তার এই সম্মানে আমরা বুক ফুলিয়ে হাঁটব। তুমি আবার কিন্তু কিন্তু করছ কেন?'

'অথৈ জল, মাঝ সমুদ্রে শুনেছি বিশাল ঢেউ। তারপর দিনের পর দিন নৌকো চালাতে হবে। ও তো ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরেই যাবে।' সরলাবা এর চেয়ে ভদ্রভাবে মনের কষ্ট বলতে পারল না। শোনামাত্র রোগা রায় হো হো করে হাসতে লাগল, 'আরে না না। তোমার ছেলে একা যাচ্ছে নাকি? আরও তিনজন আছে। ওদের সঙ্গে ভাল ভাল খাবার থাকবে, জল যা থাকবে তা সারা বছরেও ভদ্দর খায় না। তার ওপর নৌকোতে রেডিও থাকবে। বিপদ-আপদ এলেই ওরা রেডিওতে খবর পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টার চলে যাবে সাহায্য করতে।'

নারান বলল, 'নৌকোয় রেডিও থাকে বুঝি?'

রোগা রায় বলল, 'তো কি? মাছ ধরা নৌকো ভেবেছ নাকি তার গড়ন-ধরন আলাদা। তোমরা কি মনে করছ ভদ্দরের জীবনের চেয়ে শহরের তিনজনের জীবন কম দামী?'

কথাটা ঠিক। সরলাবালা মাথা নীচু করে বলল, 'তবু ভয় হচ্ছে।'

উপিনকাকা বললেন, 'বউমা, ক্ষুদিরামের নাম শুনেছ? বাঘা যতীন সুভাষ বোস? মৃত্যুকে উপেক্ষা করে তাঁরা দেশের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের জননীদের কথা মনে কর। তাঁরা পুত্রদের বাধা দেননি বরং বলেছেন এগিয়ে যেতে, উৎসাহ দিয়েছিলেন। তুমি তাঁদের কথা ভেবে মন শক্ত কর। অস্ট্রেলিয়া না কোথায় পৌঁছবার পর ভাবতে পার কি কাণ্ড হবে! যতদিন সমুদ্র থাকবে ততদিন মানুষ বলবে ভদ্র ওকে জয় করেছে।'

নারান বলল, 'অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে গেলে গবর্মেণ্ট ওকে নিশ্চয়ই খুব বড় কাজ দেবে।'

একজন মহিলা চুপচাপ শুনছিলেন, এবার মুখ খুললেন, 'তা একথা আগে বলনি কেন তোমরা? দিনে পঞ্চাশ টাকা মজুরি পাবে। আচ্ছা যদি একমাস ধরে যেতে লাগে?'

উপিনকাকা বললেন, 'এক বছর লাগলেও প্রতিদিনের জন্যে পঞ্চাশ করে পাবে। ও ফিরে এলে তোমার আর দুঃখ থাকবে না বউমা।'

মহিলাটি বললেন, 'ভগবান তোর দিকে মুখ তুলেছেন সরলা। বাপকে খেয়েছিল যে সমুদ্র ছেলে যাচ্ছে তাকে জয় করতে। ওই যে বলে না সব কিছুর বিচার এক জীবনেই হয়ে যায়।'

কথাটা মনে ধরল সরলাবালার। সমুদ্র তার সুখ কেড়ে নিয়েছিল। এত বছর ধরে সে সমুদ্রের ধার মাড়ায়নি। কিন্তু তাতে সমুদ্রের কি এল গেল? যদি ওই বড় বড় ঢেউগুলোকে তুচ্ছ করে ভদ্দর পৃথিবীর এপাশ থেকে ওপাশে চলে যেতে পারে তাহলে ওর দর্প চূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি না পারে? যদি রেডিওতে খবর পাঠাবার আগেই কিছু হয়ে যায়? যদি রেডিওটাই খারাপ হয়ে যায়? বুকের খাঁচাটা যেন নড়ে উঠল সরলাবালার। আর সেই সময় রোগা রায় জিজ্ঞাসা করল, 'সে কোথায়? হোটেলে ঢোকার আগে দেখেছিলাম বালির ওপর পড়ে আছে। বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি ভোঁ ভাঁ।' প্রশ্নটা সম্ভবত প্রত্যেকেরই। সরলাবালা মাথা নাড়ল, 'আমিও তো খুঁজে এলাম। অবশ্য বিশ্বনাথের চায়ের দোকানটা দেখিনি।' বিশ্বনাথের চায়ের দোকান খুব পুরনো। এখনও বালিতে খুঁটি পুঁতে তার ওপর তক্তা লাগিয়ে বেঞ্চ বানানো ওখানে। ভদ্র বিশ্বনাথের দোকানে জামাকাপড় রেখে অনন্ত বিশ্বাসের দেওয়া সাঁতারের প্যান্ট পরে নেমে যায় সমুদ্রে মাছ ধরতে। ফেরার সময় ওখান থেকেই পোশাক পালটায়। শোনামাত্র দুজন ছুটল বিশ্বনাথের দোকানের উদ্দেশে।

হারান বলল, 'সেবার ফারগঞ্জের একটা ছেলে একশ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছিল। উরেব্বাস, কি ভিড়! লোকে দু'দশ টাকার নোট মালার মত গেঁথে ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। ভদ্দরের বেলায় নিশ্চয়ই আরও বেশি হবে।'

রোগা রায় বলল, 'হবে কি, হয়েই গেছে। স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলের ঠাণ্ডা ঘরে আমার যে খদ্দেরের কাছে গিয়েছিলাম তিনি খবর শোনার পর বললেন, আই মাস্ট সি হিম। ওকে দেখতে চান তিনি। নিশ্চয়ই খালি হাতে নয়। ওরা এক টাকার সিগারেটে তিন টান দিয়ে ফেলে দেয়। ভদ্দরকে নিয়ে গেলেই টাকা। তা সে ছোঁড়া এখন গেল কোথায় ও ফিরে এলে বাড়িতে থাকতে বলো, আমি একটা চক্কর মেরেই আসছি।' রোগা রায় বাক্সটা নিয়ে হাঁটতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল সরলাবালা একচোখে দেখে হাঁকল, 'আচ্ছা, তোমরা এবার এসো খবরটা হবার পর মা ঘরে ফিরে ছেলের সঙ্গে দুটো মনের কথা বলবে তোমরা থাকলে সেটা হয় কি করে!'

ভিড়টা যেন নড়তে চায় না। সবাই চাইছে অন্যেরা চলে যাক সে-ই থাকবে। রোগা রায় বুঝল এখন কথা বলা যাবে না। অবশ্য কথা হল একটাই, ছেলে যদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসে তাহলে তাকে সে জামাই করতে চায়। পাঁচকান না করে সরলাবালার সঙ্গে কথাটা এখনই পাকা পাকি করে রাখা দরকার। নইলে ফিরে এলে যা দর বাড়বে তাতে কাছে ঘেঁষা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

অবশ্য ফিরলে তবেই। বড় রাস্তার দিকে যেতে যেতে রোগা রায় ভাবছিল। কত পাগল সমুদ্র পার হতে গিয়ে, হিমালয়ে উঠতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ওই একটা সুযোগ নেওয়া। মেয়ে তার সুন্দরী। যত বয়স বাড়ছে তত যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে পাড়ার ছেলেদের পাত্তা দেয় না। নজর বড় উঁচুতে। ওর বর যোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হবে তাকে। বাঁক ঘুরতেই রোগা রায় ভদ্রকে দেখতে পেল। চার-পাঁচজন ছেলের সঙ্গে হাসিমুখে আসছে স্বাস্থ্য যে কখনও কখনও পোশাককে ম্লান করে দেয় সেটা নতুন করে মনে হল রোগা রায়ের। কিন্তু ছোঁড়া ফিরছে বাড়িতে। ওর মায়ের মুখ দেখে মনে হয়েছে ব্যাপারটা হজম করতে পারছে না। ও ঘরে ফিরলেই নাটক শুরু হবে। তার ওপর পঙ্গপাল বসে আছে বাড়ির সামনে সেখানে একবার ঢুকলে কতক্ষণে বের করে আনা যাবে তার ঠিক নেই

রোগা রায় হাত তুলে ডাকল, 'ভদ্দর, তোমার বাড়িতেই গিয়েছিলাম। খুব খুশি হয়েছি বাবা। তুমি আমাদের যাকে বলে সত্যিকারের গর্ব। আমি জানি, তুমি জয়ী হবেই। খবরটা কে দিল ?'

ভদ্র বন্ধুদের দেখাল, 'এই এরা। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমি নিজের কানেই শুনেছি। খোদ দিল্লির খবরে।'

শোনামাত্র ভদ্র দূরত্ব ঘোচাল, 'ঠিক কি বলেছে বলুন তো ?'

রোগা রায় বলল, 'গিয়েছিলাম স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলে। আমার খুব বড় খদ্দের এসেছে সেখানে। টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে ওদের। ছেলে-পুলে নেই তো—!'

'না না, রেডিওতে কি বলেছিল ?' ভদ্র অসহিষ্ণু হল।

'সেখানেই শুনলাম দিল্লির খবরে তোমার নাম। বলল এই তল্লাটের সবচেয়ে উদ্যমী ছেলে হিসেবে তোমাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ওরা, মানে আর বাকিরা এসে পড়ল বলে এখানে। মন্ত্রীমশাই তোমাদের বিদায় জানাতে আসবেন। তোমার বাবা থাকলে আজ কি খুশিই না হতো।'

ভদ্রর মুখ উজ্জ্বল হল। তাকে একটু লজ্জা পেতে দেখা গেল। সেটা লক্ষ্য করে রোগা রায় বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বাবা।'

'বলুন।'

'লোহা গরম থাকতে থাকতে আঘাত করতে হয়। এখনই সময় দুটো গুছিয়ে নেওয়ার। তোমাকে আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে। উপকার হবে।' রোগা রায় নরম গলায় বলল।

'আমাকে ? কোথায় ?' ভদ্র বিস্মিত হল।

'এই স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলে।'

'উরেব্বাস! ওখানে আমাকে যেতে দেবে কেন ?' ভদ্র অবাক গলায় প্রশ্ন করল। যেন ছেলেমানুষের কথা শুনছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রোগা রায়, 'খোদ রানীসাহেবা তোমাকে স্মরণ করেছেন, ওরা ভেতরে যেতে না দিয়ে পারে!'

ঠিক তখনই ভদ্রর নজরে পড়ল রিক্সাটাকে। অনন্ত বিশ্বাস পায়ের

ওপর পা তুলে আসছেন। এই লোকটাকে দেখলেই কেমন একটা অস্বস্তি চলে আসে। সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার জন্যে উপহার দিয়েছিল বটে কিন্তু ভদ্রর মনে হয় লোকটা সবসময় অন্য কিছু ভেবে যাচ্ছে। দূর থেকেই সম্ভবত দেখতে পেয়েছিলেন অনন্ত বিশ্বাস। রিক্সা এসে থামল একেবারে সামনে। প্রায় লাফিয়ে নেমে এসে তিনি দু হাতে বুকে টেনে নিলেন, নিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'খবরটা কানে আসা পর্যন্ত তোকে খুঁজে মরছি। এতদিন নামটা তোর একার ছিল, এখন আমাদের সকলের।' আলিঙ্গনে হাঁসফাঁস করছিল ভদ্র। অথচ এক্ষেত্রে কিছু করার নেই। মানুষটা যদি সত্যি আনন্দিত হয়— ! অবশ্য একথা ঠিক অত বড় মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন করছেন যখন তখন আনন্দিত নিশ্চয়ই হয়েছেন। এর আগে বালিবাসার পথে যখনই দেখা হয়েছে তখনই বলেছেন একবার ফারগঞ্জে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ভেতর থেকে তাগিদ বোধ করেনি বলে যায়নি ভদ্র। অনন্ত বিশ্বাস এবার একটু শিথিল হয়ে বললেন, 'তোর বাড়িতে যাচ্ছিলাম। এই জেলার, দেশের মুখ রাখতে হবে কিন্তু। তুই ভেবে ছাখ, ওই দুস্তর পারাবার পার হয়ে যখন অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখবি তখন সেখানকার মানুষ তোকে কিরকম বীরের সম্মান দেবে। হ্যাঁ, মনে জোর আন। কোন কিছুতেই ভেঙে পড়বি না। যাওয়ার ব্যাপারে তোর যা যা দরকার তা আমি দেব। হাতে বেশি সময় নেই, তৈরি হতে হবে এখনই। আমি এইমাত্র মিউ-নিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ঘুরে এলাম তোর সম্পর্কে কথা বলে। উনি রাজি হচ্ছেন না। তা আমি ঠিক করেছি আমরা নিজেরাই তোকে সম্বর্ধনা দেব। কি বল হে তোমরা?'

ভদ্রর বন্ধুরা মাথা নাড়ল সোৎসাহে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল।'

ভদ্রর কাঁধে একটা হাত রাখলেন অনন্ত বিশ্বাস, 'তাহলে চলে আয় আধ ঘণ্টার মধ্যে অন দি সি হোটেলে। আমার সঙ্গে খাবি। তোমরাও এসো হে। লজ্জা কি। এত বড় আনন্দ ভাগ করে নিই সবাই। ঠিক আছে?' কথা শেষ করে অনন্ত বিশ্বাস রিক্সার দিকে এগোলেন। ভদ্র কোনওরকমে জড়তা কাটিয়ে রিক্সার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'আমি, মানে,

মায়ের সঙ্গে—

'ওহো! হ্যাঁ। শুনলাম তোমার মা তোমার খোঁজেই বেরিয়েছে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবে তারপর আসবে। মায়ের আশীর্বাদ না থাকলে কোন কিছুই সফল হয় না।' অনন্ত বিশ্বাস রিক্সায় উঠে বসলেন। ভদ্র বলল, 'আমি যদি বিকেলে যাই?'

'বিকেলে? ও বুঝেছি। রাত জেগেছ বলে ঘুমাবে? আরে যে ঘুমিয়ে থাকে তার ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকে। তার ওপর আবার ফারগঞ্জ ফিরে যেতে হবে আমাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কখন যাবে বল। যে সময় বলবে, সেটা রাখবে। বাঙালীর এই জন্যে কিছু হল'না।' অনন্ত বিশ্বাস ঈষৎ বিরক্ত হলেন।

'তিনটে।' ভদ্র জবাব দেওয়ামাত্র তিনি মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

রোগা রায় এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'যাক, তুমি যে এখনই যাওনি—।'

'কিন্তু আমি তো আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না। মাইকেল সাহেব আমাকে দুপুরে নেমন্তন্ন করেছেন। যদি সন্ধ্যেবেলায় যাওয়া যায়—! আমি বিচে থাকব, দরকার পড়লে ডাকবেন।' কথা শেষ করে ভদ্র বন্ধুদের ইশারা করে হাঁটা শুরু করল। রোগা রায় বিড়বিড় করল, 'এর মধ্যেই মাথা ঘুরে গেছে? হুম!'

বাড়িতে পৌঁছানোমাত্র ভদ্রকে নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। সবাই তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কবে যাচ্ছ, সঙ্গে যারা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কি রকম থাকবে? টাকাটা কিভাবে দেওয়া হবে? রোজ রোজ সমুদ্রে টাকা নিয়ে সে কি করবে? তার চেয়ে মাসখানেকের টাকা অন্তত আগে নিয়ে মায়ের কাছে জমা দিয়ে যাবে নিশ্চয়ই। শেষ পর্যন্ত উপিনকাকা বললেন, 'এবার ওকে ছেড়ে দাও হে। রাত জেগে মাছ ধরেছে, একটু বিশ্রাম নিতে দাও। চল সবাই।'

অনেক চেষ্টার পর ভিড়টা যখন সরল, তখন বেলা গড়িয়েছে। সরলাবালা চুপচাপ দাওয়ায় বসেছিল। ভদ্র জিজ্ঞাসা করল, 'কারখানা যাওনি?'

পুতুলের মত মাথা নাড়ল সরলাবালা, তার চোখ মাটির দিকে। ভদ্র এগিয়ে এল মায়ের সামনে, 'কি হয়েছে তোমার? ওভাবে বসে আছ কেন?'

শুকনো হাসি হাসল সরলাবালা, 'কই, কিছু হয়নি তো! যা স্নান করে খেয়ে নে। ভাত চাপা দেওয়াই আছে। আমি কারখানায় চললাম।' সরলাবালা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

'আমি দুপুরে মাইকেল সাহেবের হোটেলে খাব। খেতে বলেছেন।'

ছেলের দিকে তাকাল সরলাবালা। এবং দেখামাত্র বুকের ভেতরে লাল লোহার ছ্যাঁকা লাগল। এত যৌবন কেন ভগবান দিলেন ওকে? না, এই চেহারা সত্ত্বেও বালিবাসার কোন মেয়ের সঙ্গে ও জড়িয়ে যায়নি। এসবই কি শুধু সমুদ্রের জন্যে তৈরি হয়েছে! শিউরে উঠতে গিয়েও সামলে নিল সে। এত মানুষ তাকে বীরজননী বলছে, নিজের কথা ভাবলে লোকে ছি ছি করবে। সরলাবালা কোনওমতে বলতে পারল, 'ও, তাহলে ঠিক আছে।'

ভদ্র আশঙ্কা করেছিল এইবার ঝড় উঠবে। মায়ের চিৎকার কান্নায় সে দিশেহারা হবে। কিন্তু সেসব কিছুই হল না। মা চুপচাপ বেরিয়ে গেল কারখানার উদ্দেশে। ব্যাপারটা ক্রমশ খুব খারাপ লাগছিল ভদ্রর। এই মাকে সে চেনে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি বোকামি নয়? সমুদ্রে গেলেই বাপের মত মরে যেতে হবে? আর যে তিনজন যাচ্ছে তারা কি সে কথাটা না জেনেই যাচ্ছে! আর ওদের চেয়ে সে তো অনেক বেশি সমুদ্র দেখেছে। তবে? ভদ্র ঠিক করল রাত্রে এ বিষয়ে মাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

কারখানায় যাওয়ার পথেই গগনের বাড়ি। বাড়ি বলতে মাটির ঘরে খড়ের ছাউনি। অভাব সর্বত্র হাঁ হাঁ করছে। গগনের ছেলেটার বয়স এখন পনেরো। এতকাল চায়ের দোকানে কাজ করত, এখন সুবোধ মাইতির বাসে হেল্পার হয়েছে। গগনের বউ কমলা অসুখে ভুগে ভুগে জীর্ণ। ওকে সরলাবালা জোর করে মাইতিবাবুর কারখানায় নিয়ে

গিয়েছিল। মাসে সাতদিনও যেতে পারে কিনা সন্দেহ। গগনের মেয়ে বাসন্তী সেলাই করে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে মেসিন কিনেছিল। বস্তুত ওরই রোজগারে পরিবারটা ত্বুবেলায় পেটে কিছু দেয়। ভদ্রর বাপ আর গগন একই নৌকোয় ছিল। দুজনে একই সঙ্গে ডুবেছে। সেই সঙ্গে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে সবাইকে। সরলাবালা দাওয়ায় উঠে ডাকল, 'অ্যাই কমলা, কমলা!' ভেতর থেকে মিনমিনে গলায় সাড়া এল। দরজায় দাঁড়িয়ে সরলাবালা দেখল কমলা শুয়ে আছে। একেবারে বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে শরীর। মুখে রক্ত আছে কি না বোঝা যায় না। রোগটা কি অল্প পয়সার ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। ফারগঞ্জের ডাক্তার দশ দিন ধরে দেখে শুনে ফেরত দিয়ে বলেছে বাড়িতেই চিকিৎসা হবে।

কমলা বলল, 'দিদি!'

বয়স একই। তাই ওর সামনে আসতে সঙ্কোচ হয় সরলাবালার। ভগবান তাকে নিয়েছে কিন্তু এই হতচ্ছাড়া যৌবনটাকে নেয় না কেন? যার ছেলের বয়স তেইশ তার এমন যৌবন কি থাকা উচিত! মাঝে মাঝে মনে হয় কমলার মত শরীর হলে সে বেঁচে যেত। ভদ্রর বাপ বেঁচে থাকতেই ঠারেঠোরে কত ইঙ্গিত করেছে পাঁচজনে। মরবার পর তো কথাই নেই। এই বালিবাসার তিনজন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ছেলেসমেত। একজন তো এখনও আইবুড়ো থেকে গেল। অথচ তাদের কারো সঙ্গে সে কখনও রসের সম্পর্ক সৃষ্টি করেনি। সরলাবালা জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর কেমন?'

কমলা বলল, 'কদিন থেকে সে আসছে দিদি। এই এখানে বসে থাকছে।'

'কে?' অবাক হল সরলাবালা।

সাদা ঠোঁটেও যেন হাসি ফুটল, 'আকাশ যার নাম, তোমার ঠাকুর-পো।'

মুখে হাত চাপা দিল সরলাবালা। কমলা বলছে তখন, 'আসছে আর বলছে, চলে এসো, চলে এসো। তা আমি যেই বলি পা বাড়িয়েই

তো আছি, তুমি নিয়ে চল অমনি আর দেখতে পাই না।'

সরলাবালার মনে পড়ল আজ অবধি সে স্বপ্নেও ভদ্রর বাপকে ছ্যাখেনি। তাব শরীর শির শির করে উঠল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘোরাতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাসন্তী কোথায় ?'

'মাল দিতে গেছে। ওখান থেকে ওষুধ আনবে দোকানে গিয়ে। বসো দিদি।'

'না বসব না।' সরাসরি কাজের কথায় এল সরলাবালা, 'ঠাকুরপোকে তার বন্ধু কথা দিয়েছিল বাসন্তীকে ঘরের বউ করে নিয়ে যাবে। ঠাকুরপোরও ইচ্ছে ছিল। আমি বলি কি, তোমার যখন শরীর এমন খারাপ তখন কাজটা ছু-একদিনের মধ্যেই করে ফেলি।'

কমলা চোখ বন্ধ করল, 'ঠিক আছে, তোমার ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করি।'

'মানে ?' আঁতকে উঠল সরলাবালা, 'মরা মানুষকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে কি করে ?'

'সে তো রোজ আসছে এখন, বললাম না।'

'ছ্যাখো কমলা, ছেলেমানুষি করো না। ঠাকুরমশাই-এর সঙ্গে কথা বলব ?'

'কিন্তু দিদি, বাসুর বিয়ে হয়ে গেলে আমার কি হবে ? তার চে আমি মরে গেলে ওকে বউ করে নিয়ে যেও।' ছু চোখের কোলে জল গড়িয়ে এল।

'শোন, আমার ছেলের এখন বিয়ে দেওয়া খুব প্রয়োজন। তাছাড়া বিয়ে করেই ও কয়েক মাসের জন্যে অনেকদূর চলে যাবে। তোমার বাসু তোমার কাছেই থাকবে তখন।' সরলাবালা বলল।

খুব ক্লান্ত গলায় কমলা জবাব দিল, 'বেশ। তাই করো।'

সরলাবালা আর দাঁড়াল না। মানুষ কি রকম পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিজের জন্যে মেয়ের বিয়ে দিতে দ্বিধা করছে কমলা। এক পয়সা খরচ হবে না। শুধু-হাতে সুতো বেঁধে বিয়ে দেবে। তবু রোজগেরে মেয়েকে ছাড়তে রাজি নয়। কিন্তু আর দেরি করবে না সে। কারখানা থেকে

বেরিয়েই পুরুতঠাকুরের বাড়িতে যেতে হবে লগ্ন জানার জন্যে। জলে নামবার আগে অন্তত দু রাত্রি বউ-এর সঙ্গে ঘর করে যাক ভদ্দর। তার নিজের যেটুকু বেঁচে আছে তাই দিয়ে কোনমতে কাজটা হয়ে যাবে মনে হয়।

কারখানার কাছাকাছি পৌঁছে সে বাসন্তীকে দেখতে পেল। হাতে ওষুধের শিশি নিয়ে ফিরছে। দেখা হওয়ামাত্রই হাসল। সরলাবালার মনে হল বয়স না হতেই বয়সের ছাপ পড়ে গেছে মেয়েটার মুখে। স্বাস্থ্য জল না পাওয়া ধানগাছের মত। এমন মেয়েকে—। চকিতেই চিন্তাটাকে সরাল সে। বিয়ের জল গায়ে পড়লেই উল্টোটা হয়ে যাবে। ছেলেবেলায় তো দিনরাত পড়ে থাকতো সরলাবালার কাছে। বড় হয়ে কথাটা শোনার পরেই সম্ভবত লজ্জায় ওদিক মাড়ায় না। সামনে দাঁড়িয়ে বাসন্তী বলল, 'এইমাত্র খবরটা শুনলাম জেঠি। তুমি আগে জানতে?'

'একটু-আধটু।' মিথ্যে কথাটা অম্লানবদনে বলল সরলাবালা।

'ওঃ! খুব মজা হবে ভদ্দরদার। কত সমুদ্র, কত জল, বিদেশ-বিভুঁই। সবাই খুব গর্ব করছে ওর জন্যে। কবে যাবে গো?' চোখেমুখে কথা বলছে এখন বাসন্তী।

'এই তো, বেশি দিন নেই।' সরলাবালা কথাটা বলেই মনে করতে পারল সে নিজেও জানে না কবে ভদ্দর যাচ্ছে। কথা ঘোরাবার জন্যে সে বলল, 'তোর মায়ের কাছে গিয়েছিলাম। আমার ভাল লাগল না। মরা মানুষদের এই অবস্থায় দেখতে পাওয়া ঠিক নয়।'

বাসন্তী নিঃশ্বাস ফেলল, 'মায়ের জন্যে আমার খুব ভয় করে জেঠি।'

'হ্যাঁ। তাই তোর মাকে বলে এলাম দু-তিনদিনের মধ্যে লগ্ন ঠিক করে তোকে আমাদের ঘরে নিয়ে যাই। তোর মা দেখে যাক অন্তত।'

বাসন্তী মাথা নীচু করল। সেটা লক্ষ্য করে মানে বুঝতে চেষ্টা করল সরলাবালা। না পেরে বলল, 'তোর বাপ আর ভদ্দরের বাপের ইচ্ছে ছিল এইটে।'

'কিন্তু—।' বাসন্তীর ঠোঁট কাঁপল।

'কিন্তু কি?'

'এখন না।'

'কেন?'

'আমি পারব না।' ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলালো সে।

সরলাবালা তো অবাক, 'কেন? পারবি না কেন?'

'মায়ের এই অবস্থায় আমি কি করে বিয়ের পিঁড়িতে বসব!'

'কিন্তু ভদ্দর তো আজ বাদে কাল চলে যাবে। যাওয়ার আগেই—।'

'তোমার ছেলে ফিরে আসবে না জেঠি?'

'মানে?'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সে ফিরে এলে, তারপর না হয়।'

'কেন? এখন দোষ কোথায়? পুরুষমানুষ বিদেশে যাবে, পেছনে বউ থাকলে রাশ টানা থাকবে।'

'আমি কারো রাশ টানতে চাই না জেঠি।' বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল বাসন্তী। হঠাৎ মাথায় আগুন জ্বলে উঠল সরলাবালার। চিৎকার করে বলল, 'পিতৃসত্য না রাখলে পাপ হবে তোদেরই। যাওয়ার আগে আমি ভদ্দরের বিয়ে দেবই। তোরা যদি রাজি না হস মেয়ের অভাব হবে না।'

একটু থমকে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল বাসন্তী। তার মনে হচ্ছিল অনেকদিনের জমে-থাকা একটা চাপ হঠাৎ নেমে গেল। এখন তার পাশে অভাব আর অভাব। ভাইটা মাঝে মাঝে টাকা দেয় এবং তাতে কিছুই হয় না। মায়ের দিকে তাকালে বুক হিম হয়ে আসে। মৃত্যু মায়ের চারপাশে ওত পেতে আছে আর সে যেন অবিরত পাহারা দিয়ে চলেছে। বাসন্তী কিছুতেই হার মানবে না। কারণ মা চলে গেলেই এই বিশ্বসংসারে সে একা। তবু সে প্রস্তাবটায় রাজি হতে পারল না। যে মেয়ের বাপ মরেছে সমুদ্রে তার কখনও সাধ হয় সমুদ্রের সঙ্গে ঘর করতে? ভদ্দরকে বিয়ে করা মানে তো তাই। এই যে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে তাতে সে খুশি হতে পারে হিতৈষী হিসেবে কিন্তু নতুন বউ হয়ে পারবে? ফেরার পরে তো আবার মাঝরাত্রে সমুদ্র খুঁজে মাছ ধরার ব্যবসা শুরু করবে। যে কারণে ভাইকে সমুদ্রের

ব্যবসায় পাঠানো হয়নি সেই কারণটাকে সে মানবে কি করে? বাপ কথা দিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, সে কথা রাখার দায় তাদের। ভদ্দরকে সে বড় হবার পরেই এড়িয়ে চলেছে। স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে খারাপ নয়, কাজে ওই বয়সের অন্যান্যদের চেয়ে ঢের পটু। কিন্তু বাসন্তী জানে না কেন ওর দিকে তাকালে রক্তে তাপ লাগে না। ছেলে হিসেবে ভদ্দর তো খুবই ভাল। কোন মেয়ের সঙ্গে এই বয়সে জড়িয়ে পড়ার গল্প কানে আসেনি। তার ওপর জেলার সবাইকে টেক্কা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে। রেডিওতে নাম বলেছে। কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই বাসন্তীর মনে পড়ে ডুবে যাওয়া মানুষটার কথা। ফলে আবেগ আসে না একটুকুও। তাছাড়া কথা দেওয়ার ব্যাপারটা সে যেমন জানে ভদ্দরেরও অজানা নয়। কিন্তু আজ অবধি ও তরফ থেকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ লক্ষ্য করেনি সে। আজ সমুদ্রযাত্রা করছে বলে বিয়ে করতে হবে—এটা তো মানাই যায় না। খামোকা দুদিন ঘর করে একটা মানুষকে কে জানে হয়তো চিরজীবনের জন্যেই উধাও হয়ে যেতে দিতে হবে। পূজোর আগে বলির মত বিয়েটাকে ব্যবহার করতে চাইছে ওরা। রাজি না হয়ে সে ভালই করেছে।

এই সময় বাসন্তীর শরীর শক্ত হল। বেশ সেজেগুজে ভদ্দর আসছে। যেতে হলে ওর পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করে হাঁটছিল বাসন্তী। মুখোমুখি হওয়ামাত্র ভদ্র হাসল। বাসন্তীকে দাঁড়াতে হল। ভদ্র বলল, 'শুনেছ, ওরা আমাকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে।'

'শুনেছি।' বাসন্তী জবাব দিল।

'ও। তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'কি কথা?' বাসন্তী চারপাশে নজর বোলাল। সময়টা যেহেতু দুপুরের মাঝখানে তাই রাস্তায় লোকজন কম। কিন্তু প্রশ্নটা করেই সে বুঝতে পারল অত্যন্ত বোকামি হয়ে গিয়েছে। কথা বলার সুযোগ না দিলেই হত। ভদ্র কয়েকবার কিন্তু কিন্তু করে বলেই ফেলল, 'আমার বাপ আর তোমার বাপে মিলে যে কথা দিয়েছিল সেটা রাখবার জন্যে মা এখন ছটফট করছে। আমি সমুদ্রে যাওয়ার আগেই সেটা চুকিয়ে

ফেলতে চায়।'

'জানি। তুমি কি বলতে চাইছ তাই বল?' শক্ত মুখে প্রশ্ন করল বাসন্তী।

ভদ্র মুখ তুলল, 'আমি বলি কি, তুমি এখন মোটেই রাজি হয়ো না।'

'রাজি হবো না?' বাসন্তী হতভম্ব।

'হ্যাঁ। আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম কথাটা বলতে। গিয়ে দেখলাম কাকির শরীর খুব খারাপ। সেই কথাটাই বলো। না হলে অন্য কোন মতলব।' ভদ্র যেন মিনতি করল।

'হঠাৎ একথা?' বাসন্তী কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'মা আমাকে বাঁধতে চাইছে তোমাকে দিয়ে। কিন্তু পিছুটান রেখে আমি যেতে চাই না। আমার যদি কিছু হয় তাহলে সারাজীবন তুমি—।' কথাটা শেষ না করে ভদ্র মাথা নাড়ল, 'মায়ের মাথার ঠিক নেই।'

'বেশ। তাই হবে।' বাসন্তী মুখ ফেরাল।

'আমি বলছি না, মানে মাকে বলার দরকার নেই যে আমি বলেছি এসব। ফিরে এলে তারপর না হয় একটা কিছু ভেবেচিন্তে করা যাবে।' ভদ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'ফিরে আসার পর যদি আমি রাজি না হই, যদি অন্য কারো সঙ্গে আমার এর মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়?' প্রশ্নটা করে বড় চোখ মেলে তাকাল বাসন্তী।

ভদ্র মাথা নাড়ল, 'তাহলে তো চুকেই গেল সব।'

'ঠিক আছে।' বাসন্তী আর দাঁড়াল না। এবং এই মুহূর্তে নেমে যাওয়া চাপটা আবার ফিরে এল মনে। হাঁটতে হাঁটতে সে আবিষ্কার করল তার চোখ উপচে জল নেমে আসছে গালে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মাইকেল সাহেব ভদ্রকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। সামুদ্রিক বাতাসের দাপটে এই ঘরের জিনিসপত্র সুস্থির থাকে না। জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ তাকালে মনে হয় সমুদ্র যেন অনেক দূরে সামান্য নেমে গেছে। এই ঘরে কখনও ঢোকেনি ভদ্র। ঢুকে দেখল

দেওয়ালে দুটো ছবি রয়েছে। একটা যীশুর অন্যটি বিবেকানন্দের। একটা বড় টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে মাইকেলসাহেব বললেন, 'বসো। তুমি এখন একজন অভিযাত্রী। এই যে অভিযানে যাচ্ছ তাতে ওরা তোমাকে টাকা দেবে বটে কিন্তু আমাকে বল তো ওরা কি পাবে?' দাড়িতে হাত বোলালেন তিনি।

কথাটা যেন প্রথম মাথায় ঢুকল। ভদ্র মাথা নাড়ল। মাইকেলসাহেব বললেন, 'একটা এমন অভিযান করতে অনেক খরচ হয়। হয়তো অনেকে সাহায্য করছে কিন্তু তিনজন তোমাকে টাকা দিচ্ছে যেমন অন্য ভাবেও খরচ করছে। তার ওপর সমুদ্রে দিনের পর দিন ভেসে থাকতে হবে, দুর্ঘটনার ভয়ও রয়েছে। যে জন্যে তেনজিং-হিলারীর দল এভারেস্টে উঠেছিল সেই জন্যেই ওরা যাচ্ছে। ওরা প্রকৃতির চেহারা দেখবে, অজানাকে জানবে। তোমার কাছে যে সুযোগ এসেছে তাতে তুমিও সেটা দেখবে। জানলা দিয়ে যে সমুদ্রটাকে দেখছ সেটাই শুধু সমুদ্র নয়। পৃথিবীময় সমুদ্র ছড়ানো। কোথাও তার নাম ভারত মহাসাগর, কোথাও অতলান্তিক আবার কেথাও প্রশান্ত। এ ছাড়া অনেক ছোট ছোট নাম আছে। আর এক এক জায়গায় সমুদ্রের চরিত্র এক এক রকম। সেখানে যে সব জলচর প্রাণী বাস করে তাদের ধরনও আলাদা। এদিকে তাকাও। এটা হল পৃথিবীর ম্যাপ। হলদে সবজে জায়গাগুলো হল মাটি, এক একটা দেশ। আর নীলচে জায়গা হল সমুদ্র। মাটির চেয়ে সমুদ্র অনেক বেশি। এইটে হল ভারতবর্ষ, এখানে ওয়েস্টবেঙ্গল আর এইখানটা স্যাণ্ডি নেস্ট, বালিবাসা। আমরা এখানে রয়েছি।'

ভদ্র ঝুঁকে পড়ে জায়গাটা দেখল। তার কিছুই বোধগম্য না হলেও বুঝতে পারল নীলচে রঙটা বালিবাসার গা থেকেই শুরু হয়েছে। সে আঙুল তুলে বলল, 'এইটে সমুদ্র?'

'হ্যাঁ। ওই সমুদ্র। তোমরা এখান থেকে নৌকো ভাসাবে। একে বলা হয় বঙ্গোপসাগর। প্রায় বারোশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার নৌকো বেয়ে তোমরা রেঙ্গুনের কাছে, এই এখানে পৌঁছে যাবে। তোমাদের ডানদিকে থাকবে আন্দামান, লিটল আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপ। ওদিকে

যাওয়ার প্রয়োজন হবে না অবশ্য। রেঙ্গুন থেকে আন্দামান সমুদ্র ডিঙিয়ে বাঁ দিকে থাইল্যাণ্ডকে রেখে মালয়েশিয়াতে পৌঁছবে। এইটে এগারশো একানব্বই কিলোমিটার। তারপর এই ফাঁকটা দিয়ে সুমাত্রা আর মালয়েশিয়ার মধ্যে দিয়ে মালাক্কা প্রণালী পেরিয়ে জাকার্তায়। দূরত্বটা চৌদ্দশো ছিয়ানব্বুই কিলোমিটার। জাকার্তা থেকে এই রাস্তায় জাভা সমুদ্র দিয়ে ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে ডাইনে বাঁয়ে রেখে তোমরা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছবে চব্বিশশো কিলোমিটার জল বেয়ে। অর্থাৎ তোমাদের জলপথ প্রায় ছ হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার। এই হল অস্ট্রেলিয়া। ম্যাপে ছাখো, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর চেয়ে একে অন্যরকম দেখাচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষের চেয়ে অনেকগুণ বড় কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক কম মানুষ থাকে সেখানে। প্রকৃতি তার সম্পদে সেখানকার মানুষকে ভরিয়ে দিয়েছে। যদি তোমরা সেখানে পালতোলা নৌকোয় চেপে পৌঁছতে পার তাহলে অস্ট্রেলিয়ার মানুষ তোমাদের প্রাণভরে সম্বর্ধনা দেবে। ভদ্র, আমরা এই বালিবাসায় বসে সেই খবর শোনার জন্যে উন্মুখ থাকবো।' মাইকেলসাহেবের মুখ উজ্জ্বল।

ভদ্র আঙুল বাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ স্পর্শ করল।

সিংজীর সঙ্গে কথা শেষ করে অনন্ত বিশ্বাস 'অন দি সি' হোটেল থেকে বেরিয়ে ফারগঞ্জে যাচ্ছিলেন। বালিবাসায় তিনি ঘোরেন রিক্সায়। এখান থেকে ফেরত যাওয়া এবং আসার জন্যে তাঁর অ্যাম্বাসাডার হোটেলের সামনে থাকে। হোটেলটি ঝকঝকে। স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলের মত আধুনিকতার বৈভব না থাকলেও মধ্যম শ্রেণীর মানুষের জন্যে সব রকম আরামের ব্যবস্থা আছে। কয়েকটা ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। অনন্ত বিশ্বাস যখন রিসেপশনের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তখনই দূরে সঙ্কোচে দাঁড়ানো ভদ্রকে দেখতে পেলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ওকে না পেয়ে মনে যে উত্তাপ জন্মেছিল তা এখন ফেটে পড়ার উপক্রম হলেও কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এসে ডাকলেন, 'আরে এসো এসো। এখানে দাঁড়িয়ে কেন!' কনুই ধরে ওকে ভেতরে

নিয়ে এলেন তিনি। ভেতরে ঢুকে ভদ্র নিচু গলায় বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?'

'নিশ্চয়ই। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। তারপর, মা কি বলল?'

'কিছু না। মানে আপত্তি করেনি কিছু।'

'বাঃ! গুড! এসো এই ঘরে বসে বসে কথা বলি।' শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত সিংজির ঘরে ঢুকলেন তিনি।

সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডা যেন চেপে বসল। ভদ্রর শীত শীত বোধ এলেও আর এক ধরনের আরাম লাগছিল। সে চারপাশে তাকিয়ে কোন জানলা দেখতে পেল না। টেবিলের ওপাশে এই হোটেলের সর্দারজী মালিক এদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'বসো। সিংসাহেব, এই হল ভদ্র।'

'হাঁ?' তড়িঘড়ি শরীরটাকে সামান্য তুলে হাত বাড়ালেন সিংজী। জীবনে কখনও কেউ ভদ্রর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করেনি এইভাবে। সে অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গিতে সিংজীর শক্ত হাত স্পর্শ করল। অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'আর কয়েকদিন পরেই তুমি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভি-যাত্রী হয়ে যাবে। কিন্তু এখন থেকেই নিজেকে সেই সময়ের জন্যে তৈরি করতে হবে। তুমি আমাদের, এই বালিবাসা-ফারগঞ্জের গর্ব। আমরা ঠিক করেছি আগামী শনিবার সমুদ্রের ধারে একটি বড় মঞ্চ করে তোমার সম্বর্ধনা দেব। সিংজী সেদিন তোমাকে অভিযানের জন্যে তোমার যে সমস্ত জিনিস প্রয়োজন তাই উপহার দেবেন। ভ্যাখো ভদ্র, তোমাকে সাঁতার কাটতে দেখেই আমি বুঝেছিলাম তুমি অনেক বড় হবে। বালি-বাসার সাগরের জল নয়, গোটা পৃথিবীর সাগর তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

লজ্জায় ভদ্র মুখ নিচু করে রইল। এই বড় বড় মানুষেরা তার সম্পর্কে যা বলছে সে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। সে কি কখনও ভেবেছিল এই হোটেলের ঠাণ্ডা ঘরে বসতে পারবে? এই সময় সিংজী প্রশ্ন করলেন, 'আপ রেডি তো?'

ভদ্র মাথা নাড়ল। সিংজী বললেন, 'তো হামার একটা প্লান আছে। পঁহেলে বলিয়ে, আপকো ডেইলি খানা কি আছে? কি খান আপনি?'

'ভাত আর রুটি। মাছ।' ভদ্র বেশ ঘাবড়ে গেল।

সিংজী মাথা নাড়লেন, 'দ্যাটস দ্য হোল প্রব্লেম মিস্টার বিশ্বাস। আভি ইনকো ব্যালেন্সড ডায়েট চাহিয়ে। শুনিয়ে, হামার হোটেলে আপনি চলে আসুন। বেস্ট খাওয়া, বেস্ট রুম দেব। যাওয়ার আগে এখান থেকে বডি ফিট করে নিন। নো চার্জ। এক পয়সাও দিতে হবে না। স্রেফ দুপুর বারো বাজে রিসেপশনে দাঁড়িয়ে থাকবেন এক ঘণ্টার জন্যে।'

কথাটাকে যেন অনন্ত বিশ্বাস লুফে নিলেন, 'বাঃ! দারুণ! তুমি এখানেই চলে এস ভদ্র। সাহেবী খাওয়া-শোওয়া অভ্যেস করো। আরে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে তাহলে কোন অসুবিধে হবে না। না-না, তুমি আপত্তি করো না। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসো।'

সিংজী বলল, 'ব্যাস। ওই কথাই ফাইন্যাল। তোমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে এস এখানে।' কথা শেষ করে সিংজী ওকে নিয়ে গেলেন ঘর দেখাতে যেখানে সে থাকবে। সেখানে ঢুকে হাঁ হয়ে গেল ভদ্র। ঘরে বাইরের কোন শব্দ আসে না। মেঝে দেখা যাচ্ছে না নরম কার্পেটের জন্যে। বিছানার দিকে তাকিয়ে বুক দুরুদুরু করল। এমন ফর্সা বিছানা সে জীবনে দ্যাখেনি। পর্দা সরিয়ে দিতেই কাঁচের আড়ালে সমুদ্র দুলতে লাগল। এ ঘরেও ঠাণ্ডা আছে তবে সিংজীর ঘরের মত নয়। সিংজী বলল, 'বসবে? বিয়ার-টিয়ার আনাবো?'

'না-না।' চমকে উঠল ভদ্র। অনন্ত বিশ্বাস হাসলেন। তার পর বললেন, 'সব দেখে নিলে। এবার আমাদের কথা শুনে চল, দেখবে তোমার কোন অভাব হবে না।'

এসব তিনদিন আগের ঘটনা। তিনটে দিন যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটেছে ভদ্রর। যেদিন খবর এসেছিল রেডিও-মারফৎ সেদিন সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে লোক এসে কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে গেছে!

মাইকেলসাহেব সেই কাগজ দেখে দিয়েছেন। ভদ্রর একটা পাসপোর্ট এবং তাতে অস্ট্রেলিয়ায় পা দেবার ভিসা দরকার। যেহেতু এটা একটি বিশেষ ঘটনা তাই খুব দ্রুত কাজ হয়ে যাবে বলে জানিয়ে গেছে লোকটা। যাওয়ার সময় ছবিও নিয়ে গিয়েছে। এই কদিনে অবশ্য কতো ছবি তুলেছে লোকে তার হিসেব নেই। খবরের কাগজে ওর ছবি বেরিয়েছে আলাদা করে। এখন সেই ছবি বালিবাসার পানের দোকানে সাঁটা হয়ে গেছে। আজ শনিবার। এই কদিন সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়নি সে। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে সামান্য কিছু মাছের জন্যে যদি চোট বা কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তবে সবকিছু বানচাল হয়ে যাবে। অনন্ত বিশ্বাস এবং সিংজীর অনুরোধে ভদ্র এখন উঠে এসেছে 'অন দি সি' হোটেলে। এত আরাম সে জীবনে ভোগ করেনি। হোটেলের রিসেপশ-নিস্ট তাকে রীতিমত পরিশ্রম করে সহবত এবং কিছু ইংরেজি শব্দ শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

ভদ্রর পুরনো বন্ধুবান্ধবরা ইচ্ছে হলেই ওর দেখা পাচ্ছেন না। ব্যাপারটায় সবচেয়ে অখুশি হয়েছেন ব্রজকাকা। ভদ্রকে না পেয়ে তিনি আর একজনকে সঙ্গী করে মাছ ধরতে গিয়ে প্রায় খালি হাতে ফিরে এসেছেন। ফলে এখন তাঁর মাছ ধরা প্রায় বন্ধ।

সরলাবালা প্রথমে ভদ্রর হোটেলে গিয়ে থাকা নিয়ে আপত্তি করেনি। ওই দুটো হোটেলের ভেতরে পা দেবার ক্ষমতা তাদের নেই অথচ ছেলেকে ওরা আদর করে বিনি পয়সায় থাকতে দেবে এটা তো তার মাথাকে পাঁচজনের সামনে বড় করে তুলবে। কিন্তু পরের দিনই তার মনে হল ছেলেকে সবাই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। বাসন্তীর মুখে ওই কথা শোনার পর সে আর ওদের বাড়ির দিকে যায়নি। সেই সময় রোগা রায় এল তার কাছে। অনুযোগের গলায় বলল, 'কিছু মনে কর না বউঠান, প্রাণে বড় দুঃখ পেয়েছি। ভদ্দরটা আমার কথা রাখল না। স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলে আবার ঢোকার মুখ আমার নেই।'

সরলাবালা মাথা নিচু করে বসে রইল। রোগা রায় বলল, 'তুমি একটু বুঝিয়ে বলো। ও স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলে যদি থাকতে চায় তাহলে আমি

মেমসাহেবকে বলতে পারি। 'অন দি সি' হোটেলের চেয়ে স্যাণ্ডি নেস্ট কত বড় হোটেল। মেমসাহেব বললেই মালিক রাজি হয়ে যাবে।'

সরলাবালার এসবে মন ছিল না। সমুদ্রে যাওয়ার আগে ছেলেকে বিয়ের পিঁড়িতে না বসিয়ে ছাড়বে না। অবিরত এই একটা চিন্তা তাকে পীড়িত করছিল কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিল না সে। যার বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে তার কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেলেই শুনতে হচ্ছে ছেলে সুস্থ হয়ে ফিরে এলে কন্যাদান করতে আপত্তি নেই। নাজেহাল হয়ে সরলাবালা আবার বাসন্তীর বাড়িতে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল এই সময় রোগা রায় বলল, 'আর একটা কথা। ভদ্দর আমাদের ছেলে ভাল। সঙ্গদোষে স্বভাবের বিরুদ্ধে। কিন্তু তা বলে আমার কোন রাগ নেই। আমার ইচ্ছে ওকে ছেলের মত পাই। আমার মেয়েকে তো সবাই সুন্দরী বলে। তোমার আপত্তি আছে?'

চমকে মুখ তুলে তাকাল সরলাবালা। রোগা রায়ের মেয়ের মুখটা চোখের সামনে ভাসল। গায়ের রঙ তেমন ফর্সা নয় কিন্তু ওকে শাড়ি পরা অবস্থায় খুব কম দেখেছে সে। অথচ বয়স কুড়ির খুব নিচে নয়। কথাবার্তায় জেলেপাড়ার কোন মেয়ের সঙ্গে মেলে না। পাঁচজনে অবশ্য সব সময় সত্যি কথা বলে না কিন্তু রোগা রায়ের মেয়েকে নিয়ে উল্টো-পাল্টা কথা কানে আসে। এমন মেয়েকে স্বাভাবিক সময়ে ঘরের বউ করে নিয়ে আসার কথা ভাবত না সরলাবালা। এখন অবশ্য অন্য একটা চিন্তা তার মাথায় এল। ছেলে বিদেশ থেকে ঘুরে এলে ওই রকম মেমসাহেব-মার্কা মেয়েই তার উপযুক্ত হবে। সরলাবালা আর দেরি করল না। পরিষ্কার বলল, 'এ তো ভাল কথা। আপনার মেয়ের সঙ্গে ভদ্দরের বিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই।'

রোগা রায় হাসল, 'যাক আমি নিশ্চিন্ত হলাম। শ্রীমান ফিরে এলেই ব্যবস্থা হবে।'

'না। যদি বিয়ে দিতে হয় ওর যাওয়ার আগেই দিতে হবে। নইলে নয়।' দৃঢ় গলায় বলল সরলাবালা।

'কিন্তু, কিন্তু—' রোগা রায় বিড়বিড় করল।

'কিন্তু কিন্তু বললে তো হবে না। ছেলেকে জামাই হিসেবে চাইছে অনেকে। মুশকিল হয়েছে, আমি তো হুট করে কোন মেয়েকে ঘরের বউ করে আনতে পারি না। অথচ হাতে বেশি সময় নেই। এখনই বড় হোটেলে তাকে বিনি পয়সায় থাকতে দিচ্ছে, কলকাতার কাগজে ছবি বেরিয়েছে। ফিরে এলে যা হবে তা তো কল্পনায় আসে না। এরকম জামাই পাওয়ার সময় কিন্তু বললে হবে?'

মনের রাগ চেপে কথা বলায় অন্যরকম শোনাচ্ছিল সরলাবালার গলা।

'না, আমি বলছিলাম কি, প্রকৃতির কথা বলা যায় না, যদি মরে যায়।' সঙ্কোচের কারণটা স্পষ্টই বলে ফেলল রোগা রায়। সরলাবালা বলল, 'মরলে আমি পুত্রহারা হব। আমার চেয়ে তো আপনার মেয়ের শোক বেশি হবে না। হবে?'

'না না, তা কি করে হয়?' দ্রুত মাথা নাড়ল রোগা রায়।

'ছেলে গেলে ছেলে পাব না আমি। কিন্তু আপনার মেয়ের যা বয়স তাতে স্বামী গেলে স্বামী পাবে। স্বভাব চরিত্র নিয়ে কিছু কথা তো আমারও কানে এসেছে। কুড়ি বছরেও স্কার্ট পরলে ওরকম কথা রটেই থাকে। ঘরের বউ হয়ে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে বলেই মনে হয় আমার।'

রোগা রায় মাথা নিচু করল। মেয়ের স্বভাব নিয়ে যে কিছু কিছু কথা উড়ছে সেটা যে কানে আসেনি তা নয়। একেবারে গোত্র ছাড়া মেয়ে হয়েছে। চলনে বলনে আদিখ্যেতায়। রোগা রায় এক পলকেই ভেবে নিল, 'সবই ঠিক। তবে কিনা, আজকালকার ছেলেমেয়ে, মতামত দেওয়ার আগে ওর সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে চাই।'

'সেটা আমাকে আজকের মধ্যে জানান।' সরলাবালা কথা শেষ করল।

রোগা রায়ের মাথায় দুটো ভাবনা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এটা ঠিক, বিয়ে দিলে মেয়ে বিধবা হতে পারে। আবার ভদ্দর যদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসে তাহলে অমন জামাই পাওয়ার ভাগ্য এ জীবনে হবে না। বাড়িতে ঢুকে সে মেয়ের খোঁজ

করল। সম্পর্কিত একজন বিধবা পিসি বাড়িতে থাকে, তার কাছে জানতে পারল মেয়ে গেছে বিচে বেড়াতে। রোগা রায়ের আচমকা মাথা গরম হয়ে গেল। বিশ বছরের ধিঙ্গি মেয়ে একা একা বিচে বেড়াতে গেছেন। অনেকবার নিষেধ করেছে রোগা রায়। এখন ট্যুরিস্টে ট্যুরিস্টে ছেয়ে গেছে বালিবাসা। রোগা রায় আবার বের হল মেয়েকে খুঁজতে।

সারাদিন ধরে বালিবাসা, ফারগঞ্জ, হিতেলপুরে রিক্সায় মাইক বেঁধে ঘোষণা করা হয়েছে জমায়েত হবার জন্যে। এ কোন রাজনৈতিক দলের ডাক নয়। এই উপজেলার গর্ব তরুণ ভদ্রকে সম্বর্ধনা জানানো হবে বালিবাসার বালুবেলায়। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য দলে দলে জমায়েত হওয়া। বস্তুত দুপুরের পর থেকেই বালিবাসা অথবা স্যাণ্ডি নেস্টে মানুষের আগমন শুরু হয়ে গেল। সকালেই সমুদ্রমুখী মঞ্চ তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। অনন্ত বিশ্বাস আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। 'অন দি সি' হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে জনতার চেহারা দেখে তাঁর দুশ্চিন্তা কমে এল। আজ যদি লোক না হত তাহলে সেটা নিশ্চয়ই পরাজয় বলে তিনি স্বীকার করতেন। অবশ্য মানুষের সেন্টিমেণ্টকে যত রকমে সম্ভব খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে তাঁর কর্মচারীরা এবং সফল হয়েছে। একটু আগে জেলাশাসকের টেলিফোন পেয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠান শুরু হবার দশ মিনিট আগেই এসে পড়বেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনন্ত বিশ্বাস সভা করবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে অনুমতি নিয়েছেন বটে কিন্তু সুবোধ মাইতিকে নেমন্তন্ন করেননি। তিনি জানেন তখন মুখে যাই বলুন মাইতিবাবু এখন জনতার চেহারা দেখে নিশ্চয়ই হাত কামড়াচ্ছেন। অনন্ত বিশ্বাস স্থির করেই রেখেছিলেন সুবোধ মাইতির কাছে বিকেলের মুখে নিজে যাবেন। সাদরে আমন্ত্রণ জানাবেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে। যদি আসেন তাহলে নিজের বক্তৃতার সময়ে ঘুরিয়ে বলবেন সুবোধ মাইতি মশাই শেষ মুহূর্তে রাজি হয়েছেন বলে তিনি কৃতজ্ঞ। আর যদি রাজি না হন তো সুবর্ণ সুযোগ এসে যাবে সেই কথা জন-সাধারণকে জানানোর।

নিজের ঘরে আরামে শুয়ে ছিল ভদ্র। এই বিছানা, এই বাথরুম, টেলিফোন সে কখনও ব্যবহার করতে পারবে ভাবেনি। এতদিন কত কষ্টে তাদের জীবন কাটতো এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। দুপুরে যখন রিসেপশনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন নতুন বোর্ডাররা তার দিকে সসম্ভ্রমে তাকায়। ভারী ভাল লাগে সে-সময়। গতকাল একদল সাংবাদিক এসেছিল তার ইণ্টারভিউ নিতে। সে নিজে যা বলেছে অনন্ত বিশ্বাস বলেছে ঢের বেশি। আজ বিকেলে তার সম্বর্ধনা হবে। ভাবতেই সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। শুয়ে শুয়ে ভদ্র ভেবে পাচ্ছিল না মঞ্চে উঠে কি বলবে।

গতকাল মা এসেছিল। মাকে অমন ফর্সা কাপড় পরতে সে কখনও দ্যাখেনি। রিসেপশন থেকে খবর পাঠানোর পর সে নেমে গিয়েছিল। সিংজীর দেওয়া নতুন জামাপ্যাণ্ট দেখে মা বিভোর হয়ে তাকিয়েছিল। আর মাকে দেখামাত্র তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। ছেলেবেলা থেকেই সে কখনও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেনি। এখন এই হোটেলের আরামে থেকেও তার সেই স্বভাবটা ফিরে এল। মা নিজেকে সামলে নিয়েছিল দ্রুত। বলেছিল, 'বাঁচবি কি মরবি তা ভগবান জানেন। যেতে চাইছিস বলে বাধা দিচ্ছি না কিন্তু আমি একা থাকতে পারব না। তোকে বিয়ে করে বউ রেখে যেতে হবে।'

ভদ্র অসহায়ভাবে তাকাল। সে প্রতিবাদ করতে চাইল কিন্তু মুখে ভাষা এল না। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে বলতে পারল, 'বাসুর মার শরীর খারাপ। এখনই—।'

'বাসুর সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্ছি না। এ মেয়ের সঙ্গে তোর মানাবে ভাল। বিয়ের ব্যাপারে মাইতি মশাই-এর সঙ্গে কথা বলব। তুই অনন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দে।'

সরলাবালা দৃঢ় গলায় বলল। সে লক্ষ্য করছিল হোটেলের অনেকেই তাদের লক্ষ্য করছে। এটা যে ছেলের কারণেই তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

'ভদ্র হকচকিয়ে গেল, 'কেন? কি হবে আলাপ করে?'

'সবাই বলছে উনি তোকে খুব পছন্দ করেন। বিয়েটা যাতে ভাল-ভাবে হয় তার জন্যে চাইলে কিছু টাকা পয়সা নিশ্চয়ই দেবেন। অত বড়লোক!' সরলাবালা জানাল।

ভদ্র কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। গতকালই অনন্ত বিশ্বাস বলেছেন, 'এ জেলার আর পাঁচটা ছেলের মত হাফপ্যান্ট ছাড়তে না ছাড়তেই বিয়ে করে বসনি, ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে এলিয়ে পড়নি বলে আজ তোমার সামনে সুযোগ এসেছে।' সেই লোককে মা বলবে ভদ্দর বিয়ে করছে টাকা দাও! অসম্ভব! সে বলল, 'উনি বিয়ের নামে রেগে যাবেন।'

'কেন? রাগবে কেন?' সরলাবালার চোখ ছোট হয়ে এল।

'বিয়ে পছন্দ করেন না।'

'তা তো করবেই না। সে আমি নজর দেখে বুঝেছি। লোকে যা বলে তাহলে তা মিছে নয়।'

'কিন্তু মা, আমি কাকে বিয়ে করছি?'

'যাকেই হোক। আমি যাকে স্থির করব সেই হবে তোর বউ।'

এই সময় হোটেলের সামনে গুঞ্জন উঠল। বেয়ারারা ছুটোছুটি শুরু করল। ভদ্র দেখল কয়েকটা সুটকেস ভেতরে এল। বড় বড় কাঠের বাক্স আসছে। এবং তাদের সঙ্গে একটি মেয়ে, যার পরনে জিনসের প্যান্ট এবং হলুদ গেঞ্জি, তরতরে পা ফেলে কাউন্টারে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করল। রিসেপশনের লোকটি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে খানিকটা কথা বলার পর হাত তুলে ভদ্রদের দেখিয়ে দিল। এই ব্যাপারটায় ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ভদ্র। নতুন খদ্দের এলেই ওরা তাকে দেখিয়ে দেয়। সে মুখ ফিরিয়ে মাকে বলতে গেল তোমার যা ইচ্ছে তাই করো এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ এবং নারীকণ্ঠে 'নমস্কার' শুনতে পেল। সরলাবালা দেখেছিল মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে। হাতে সিগারেট, চুল দেখে অবশ্য মেয়ে বলে চেনা যায় না। ভদ্র অবাক হয়ে তাকাতেই মেয়েটি বলল, 'আরে! আমাকে চিনতে পারছেন না? অথচ আমিই আপনাকে সবচেয়ে বেশি সুপারিশ করেছি। আমি তিস্তা। এই অস্ট্রেলিয়ান এক্সপিডিশন টিমের মেম্বার। গতবার এসেছিলাম আপনার

সিলেকশনের সময়।'

বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল যেন। ভদ্র সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তিন বাবুবিবির একজন ইনি। লম্বায় তার চিবুকের সমান যখন তখন সেটা কম নয়। অত্যন্ত দুর্বল ভঙ্গিতে সে হাত দুটো যুক্ত করে বুকের ওপর তুলল। কিন্তু ততক্ষণে তিস্তা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, 'আরে নমস্কার কেন? হাতে হাত মেলাও। লেটস ফিল ইচ আদার টাচ।'

প্রসারিত হাতের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে কেমন অসাড় হয়ে এল শরীরটা। ভদ্র হাত বাড়াল। খুব নরম নয়, কিন্তু একটা উত্তপ্ত অনুভূতি সঞ্চারিত হল শরীরে। তিস্তা বলল, 'আমি আগে চলে এলাম জিনিসপত্র নিয়ে। সুদীপ আর মানব আসছে আগামীকাল। ঠিক ছিল 'ভালবাসা' নামে বিদেশী ভদ্রলোকের যে হোটেলটা এখানে রয়েছে সেখানেই উঠব। কিন্তু এই 'অন দি সি' নিজে থেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকতে অনুরোধ করেছে। নাউ, টেল মি, হাউ ডু ইউ ডু?' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল তিস্তা।

শেষ প্রশ্নটার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারত না ভদ্র যদি এই হোটেলে না থাকত। যে কয়েকটা ইংরেজি শব্দের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে এটি তার মধ্যে পড়ে। সে মাথা নেড়ে বলল, 'ভাল।' কিন্তু তারপর আর শব্দ মুখে এল না।

তিস্তা বলল, 'উই আর রিয়েলি সরি যে তোমাকে প্রিপারেশনের সময় দেওয়া হয়নি। ইন ফ্যাক্ট মাঝখানে এমন অবস্থা হয়েছিল এই অভিযান বাতিল করে দিতে হত। যদি স্পোর্টস মিনিস্টার এগিয়ে না আসতেন তাহলে কিছু করার থাকত না। তোমার পাসপোর্ট নিয়ে তাই একটু ঝামেলা হচ্ছে। সময় কম বলে। কিন্তু মনে হয় ম্যানেজ করা যাবে। কিন্তু তুমি এখানে কার জন্যে অপেক্ষা করছ?'

'আমি, আমাকে এই হোটেলে থাকতে দিয়েছে।'

'তাই নাকি! বিউটিফুল! খুব ভাল হল তাহলে। আমি ওদের বলছি তোমার পাশের রুম আমাকে অ্যালট করতে। পরে জমিয়ে আড্ডা মারব। আসছি।' যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল তিস্তা। ভদ্রর হত-

ভস্ব ভাবটা কেটে গেল মায়ের কথায়, 'এই মেয়েছেলে তোর সঙ্গে যাবে নাকি ? কি রে ?'

ভদ্র বলল, 'আমার সঙ্গে নয়, ওরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে তোমার বিয়ে না করে যাওয়া একদম চলবে না।' সাফ জানিয়ে দিল সরলাবালা।

'কেন ?' শেষবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল ভদ্র। তিস্তা তখন রিসেপশনে কথা বলছে। তাকে পেছন থেকে দেখছে ভদ্র। এত স্মার্ট মেয়ে সে কখনও ত্মাখেনি।

'ওই মেয়ের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে তোমার ঘরে বউ থাকা দরকার। এরকম মেয়ে যাচ্ছে জানলে আমি কখনই রাজি হতাম না। রোগা রায় বলে গেছে বিকেলের মধ্যে বলে যাবে কবে বিয়ে হবে।' শেষটা কল্পনা করে নিল সরলাবালা।

'রোগা রায় ? ওর মেমসাহেব-মার্কা মেয়েটা তো ভাল নয়। ছুটো ছেলের সঙ্গে ঘুরত।' প্রায় আঁতকে উঠল ভদ্র। সরলাবালা চাপা গলায় বলল, 'ঘুরত তো কি হয়েছে! এখন না ঘুরলেই হল। তাছাড়া তখন বয়স কম ছিল, বুঝত না। কিন্তু ফিরে এলে তোর যুগ্যি হবে। রোগা রায়ের মেয়ে চোখেমুখে কথা বলে। এর চেয়ে ঢের ভাল।'

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর তিস্তা এল ভদ্রর ঘরে। এসে বলল, 'কনগ্রাচুলেশন। শুনলাম আজ তোমাকে এই জেলা থেকে সম্বর্ধনা জানাবে।'

একা এই রকম ঘরে কোন মহিলার সঙ্গে কথা বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে আরও নার্ভাস হয়ে গেল ভদ্র। তিস্তার কথার উত্তরে সে বোকা বোকা হাসল।

তিস্তা বলল, 'কি ব্যাপার, আমাকে বসতে পর্যন্ত বলছ না ?'

ভদ্র কিন্তু কিন্তু করে বলেই ফেলল, 'বাইরে বসে কথা বলা যায়। মানে সিংজী বলেছেন ঘরে আড্ডা না দিতে। তাই আর কি !'

তিস্তা সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলতেই রিসেপশনিস্ট সাড়া দিল।

তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কোন বোর্ডারকে কি বলতে পারেন সে ঘরে আড্ডা মারবে কি মারবে না ? না না, আপনারা তাই বলেছেন। আমি তিস্তা সেন, আমার সহযোগী ভদ্রবাবুর ঘরে আমায় ও এই কথা বলল। যদি তাই ভেবে থাকেন তাহলে এখনই হোটেল ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। কি বললেন ? ও। দ্যাটস রাইট। থ্যাঙ্কস।' রিসিভার নামিয়ে রেখে শব্দ করে হেসে উঠল তিস্তা, 'ওরা তোমাকে বলেছে কারণ লোকাল লোক দলে দলে এলে তোমারই অসুবিধে হবে।' প্রায় লাফিয়ে খাটে উঠে তিস্তা বালিস টেনে পকেট থেকে সিগারেট বের করল, 'নাও।' ভদ্র দ্রুত মাথা নাড়ল, 'আমি খাই না।'

'গুড ! এটাই আমার একমাত্র প্রব্লেম হবে। মানব বলছে নৌকোয় উঠেই খাওয়া বন্ধ করতে। কিন্তু আমি তা পারব না। এক বছর চলার মত স্টক সঙ্গে এনেছি। যদি নষ্ট না হয়ে যায় তো ঠিক আছে।' সিগারেট ধরিয়ে তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'সেবার তো তোমার সঙ্গে ডিটেলসে আলাপ হয়নি। ওই 'ভালবাসা' হোটেলের মালিক মাইকেলসাহেব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ওঁর কাছেই বায়োডাটা পেয়েছি। তোমার বাবা সমুদ্রে ডুবে গিয়েছেন ?'

মাথা নাড়ল ভদ্র। তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'তবু তুমি সমুদ্রকে ভয় পাও না ?'

'না।' উত্তরটা চটপট বেরিয়ে এল।

'গুড !' তিস্তা ধোঁওয়া ছাড়ল, 'কতদূর পড়েছ তুমি ?'

'বাপ মরে যাওয়া পর্যন্ত। ফাইভ।'

'রোজ রাত্রে মাছ ধরতে যাও শুনেছি। কেমন রোজগার হয় ?'

'ব্রজকাকা পনের কুড়ি দেয়।'

'ব্রজকাকা কে ?'

'বাপের ভাই। তবে আলাদা থাকে। এক নৌকোয় মাছ ধরি।'

'ও। বিয়ে করোনি জেনেছি, প্রেম-ট্রেম ?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ভদ্র। একটু রক্ত জমল কানে। কোন মেয়ের মুখে এমন প্রশ্ন সে কখনও শোনেনি। তিস্তা সেটা লক্ষ্য করল। তারপর খুব

সাধারণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'প্রেম না করেও অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে অনেকে শুয়ে থাকে। তোমার যদি সেরকম অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে খুলে বল। সাইকিয়াট্রিস্টের মতে যে একবার ওই স্বাদ পেয়েছে তার পক্ষে দীর্ঘদিন স্থলে স্টার্ভ করা যদিও সম্ভব হয় কিন্তু সমুদ্রের নিঃসঙ্গতায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। হয়তো তাই থেকে এক ধরনের মেণ্টাল ডিস-অর্ডার শুরু হয়ে যায়। কাম আউট উইদ দ্য ট্রুথ। সত্যি কথাটা বলে ফেল তো খোকা!' শেষ শব্দটি কানে যাওয়ামাত্র চমকে তাকাল ভদ্র। তিস্তা তার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে অথচ ঠোঁট টিপে এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলার পর তাকিয়ে আছে যেন কত রাশভারী। তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

মাথা নাড়ল ভদ্র, 'ওসব কখনও ভাবিইনি।'

'গুড।' উঠে বসল তিস্তা, 'চুকে গেল। আমরা চারজন এখন দিনের পর দিন মাসের পর মাস সমুদ্রে থাকব একসঙ্গে। আমরা কেউ নারী বা আরে পুরুষ নই তখন। আমরা মানুষ। সমুদ্র ডিঙিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছি। আরে এককালে এখান থেকেই নৌকো ভাসিয়ে জাভা বোর্নিও যেত মানুষ। আমরা আর একটু বেশি যাচ্ছি কয়েকশো বছর পরে। আমাদের যাওয়ার রুটটা তুমি জানো?'

'হ্যাঁ। মাইকেলসাহেব বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'গুড। তোমার যদি কোন কাজ এখানে থাকে তা শেষ করে নাও। ফিরতে বেশ দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে। মানব এসে তোমার টাকা নিয়ে কথা বলবে। ফিনান্স ওই দেখছে'

তিস্তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অনেকক্ষণ ধরে বুকের ভেতর পাক খাওয়া দুটো কথা বলে ফেলল ভদ্র, 'দুটো কথা। আমি কি কি জিনিস সঙ্গে নেব?'

'এক সেট ভাল জামা প্যাণ্ট জুতো। বাকি যা লাগবে তা আমরা নিচ্ছি। ও হ্যাঁ, এক ডজন সুইমিং কস্টুম। না থাকলে সর্টস। দ্বিতীয় কথাটা কি?' দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল তিস্তা। তার সিগারেট না ধরা হাত ছেলেলি চুলের মসৃণতা অনুভব করছিল।

'মা জেদ ধরেছে যাওয়ার আগে আমার বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনতে চায়।' খুব নিচু গলায় কথাটা ভদ্র জানাতেই চোখ বড় হয়ে গেল তিস্তার, 'মাই গড!'

অনুযোগ ফুটে উঠল ভদ্রর গলায়, 'মা কিছুতেই শুনতে চাইছে না। যে মেয়ে পাচ্ছে তার সঙ্গেই সম্বন্ধ করছে। তোমাকে দেখে আরও— !'

'আমাকে দেখে? তোমার মা আমাকে দেখল কখন? আমি কি করলাম?' তিস্তা স্তম্ভিত।

'না না। তুমি তো মেয়ে, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, তোমার মত মেয়েকে মা আগে কখনও দ্যাখেনি। সেইজন্যে বিয়েটা লাগাতে চাইছে।' অপরাধীর গলায় জানাল ভদ্র।

'কেন, আমি কি তোমাকে খেয়ে নেব? কি রকম পুরুষ হে তুমি?'

'আমি না। মা ভাবছে। জানো যে মেয়েকে এখন ঠিক করেছে সে এর মধ্যে তিন তিনটে ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছে। আমাদের সঙ্গে বনবে না। কিন্তু মা বলল ফিরে এলে সে নাকি আমার যুগ্যি হবে। আমি যে মাকে কি করে বোঝাই!'

'তোমার মাকে তুমি বোঝাবে। তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে থাকলে তুমি করবে। তবে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে মেয়ে তিনটে প্রেম করেছে সে যদি বিয়ের পর এক বছর তোমাকে না পায় তাহলে মুখ বুজে উপবাসী থাকবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। তার চেয়ে ওকে আরও এক আধটা প্রেম করতে দাও। ফিরে এসে বিয়ে করে এমন ভালবাসো যাতে ওর কোন অভাব না থাকে।' তিস্তার কথা শেষ হওয়া মাত্র দরজায় শব্দ হল। তিস্তা সতেজে দরজা খুলে ধরতে অনন্ত বিশ্বাসের গলা শুনতে পেল ভদ্র, 'নমস্কার নমস্কার। আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি সর্বত্র। ভেতরে আসতে পারি?'

'কে আপনি?' তিস্তার মেজাজ তখনও চড়ায়।

'লোকে আমাকে বিশ্বাসমশাই বলে ডাকে। বাপ নাম রেখেছিল অনন্ত। তারপর থেকেই যারা ওই অনন্তমুখী হতে চায় তাদের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। নিজে পদ্মলোচন নামক কানা ছেলেটি, সত্যিকারের পদ্ম-

লোচনকে বাহবা দেবেই।' বলতে বলতে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন অনন্ত বিশ্বাস তিস্তা সরে যাচ্ছে দেখে। ভদ্র উঠে দাঁড়িয়েছিল গলা শুনেই। অনন্ত বিশ্বাস তাকে বললেন, 'দিনের পর দিন একসঙ্গে নৌকোয় থাকতে হবে তাই এখন একটু বোঝাপড়া করে নেওয়া হচ্ছে? বাঃ বাঃ বেশ! তা আমার পরিচয়টা দাও ওঁকে।'

অনন্ত বিশ্বাসের ঠিক কি পরিচয় দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে ভদ্র বলল, 'উনি আমাকে এখানে এনেছেন। এর আগে সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছিলাম বলে প্রাইজ দিয়েছিলেন।'

'দূর! শুনুন। আমার নাম অনন্ত বিশ্বাস, আগেই বলেছি। ফারগঞ্জে ব্যবসা করি, নিঃশ্বাস নিতে আসি বালিবাসায়। ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকা পয়সা কিছু হয়েছে। তা আমি যখন শুনলাম নৌকো করে কিছু ছেলে-মেয়ে সমুদ্র পার হতে চায় তখনই মন নেচে উঠল। আমাদের ভদ্রবাবুকে নির্বাচন করা হয়েছে জানার পর আরও খুশি হয়েছি। একটু আগে জানতে পারলাম আপনি একা আগে চলে এসেছেন। একেই বলে সৌভাগ্য। আজ এই জেলার পক্ষ থেকে আমাদের ঘরের ছেলে ভদ্রকে আমরা সম্বর্ধনা জানাতে চাই। সেখানে আপনাকে আসতে হবে।' অনন্ত বিশ্বাস কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত হাত জোড় করলেন।

তিস্তা মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো। লোকটি অর্থবান। পেট্রন হিসেবে নিজেকে জাহির করে কেউ কেউ নাম কিনতে চায়, এও বোধ হয় তেমনি। সে বলল, 'আমাকে কেন? এ আপনাদের ঘরের অনুষ্ঠান, আমি বাইরের লোক, আমাকে বাদ দিন।'

সামান্য জিভ বের করে বন্ধ চোখে দ্রুত মাথা নাড়লেন অনন্ত বিশ্বাস, 'যে দেশে শিলা নেই সেই দেশেও শিবপূজা হয়। কিন্তু শিবের সামনে অন্নপূর্ণা এসে দাঁড়ালে পূজোর ধারাই পাল্টে যায়। উচিত ছিল সবাই, মানে আপনাদের চারজনকে নিয়েই অনুষ্ঠানটা করি। কিন্তু লোকের তো তর সইল না। কিন্তু আপনি আমাদের মধ্যে এসে পড়েছেন, ভদ্রকে নিয়ে আপনারাই যাচ্ছেন অথচ অনুষ্ঠানে আসছেন না, এটা আমাদের লজ্জার বিষয় হবে। ওহে তুমি কিছু বল।' শেষ কথাটা ভদ্রর উদ্দেশে হওয়ায়

সে সরল গলায় বলল, 'গেলে সবাই খুশি হবে।'

'কখন?'

'এই আর একটু পরেই।'

'বেশ। মনে হচ্ছে আপনি ভদ্রকে ভালবাসেন। আমি যাব কিন্তু ওর সমস্যা নিয়ে আপনি একটু ভাবুন। মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে সম্বর্ধনা নিতে কি কারো ভাল লাগে?

অবাক চোখে ভদ্রর দিকে তাকালেন অনন্ত বিশ্বাস, 'আবার কি হল?' ভদ্র সংকোচে মুখ ফেরাল। তিস্তাকে সে কথা বলার তোড়ে বিয়ের কথা বলে ফেলেছিল। সেই ব্যাপার যে অনন্ত বিশ্বাসের কানে তুলবে তা কে জানত। ওকে মুখ ফেরাতে দেখে অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। সুবোধ মাইতি চাল চেলেছে। স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেল থেকে কেউ এসেছিল?'

'না না।' মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল ভদ্র, 'মা ছাড়া কেউ আসেনি।'

'ও। মা। তা মা আবার কি ঝামেলা পাকাল।'

'মা, মানে যাওয়ার আগে মা আমার বিয়ে দিতে চাইছে। নইলে ছাড়বে না বলেছে।'

'সর্বনাশ!' অনন্ত বিশ্বাস চমকে উঠলেন, 'তুমি যাবে সমুদ্রে নতুন বউকে ফেলে রেখে? তাকে খাওয়াবে কে? সেই মেয়েটার কি অবস্থা হবে? পাত্রীটি কোথাকার?'

'এখানকারই।'

'তোমার পছন্দের?'

'না না।' সরাসরি বলে ফেলল ভদ্র, 'ওর চরিত্র সুবিধের নয়।'

'বালিবাসার কোন মেয়ে? কার মেয়ে?'

'রোগা রায়ের ছোট মেয়ে।'

'রোগা? আমাদের ম্যাসেজ-করিয়ে রোগা রায়! তা কথাটা মাকে বলে দাও।'

'বলেছি। শুনতে চাইছে না।'

অনন্ত বিশ্বাস মাথা নাড়লেন, 'ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমার ওপর

ছেড়ে দাও। এই বিয়ে তোমাকে করতে হবে না। মানে যাওয়ার আগে তোমাকে বিয়েই করতে হবে না।'

অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা বাসস্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আজ রাস্তায় বেশ ভিড়। বালির চরে মানুষ জমছে। গাড়ি থেকে একজন লোক নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে যাকে দেখতে পেল সেই হল রোগা রায়। বালির চরে মেয়েকে না পেয়ে হনহনিয়ে আসছিল সে। লোকটা ডেকে বলল, "আচ্ছা, বলতে পারেন ভদ্রর বাড়িটা কোথায়?'

'বাড়ি চাই না ওকে চাই?' রোগা রায় গাড়িটা দেখল। একটু আগে স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলের বেয়ারার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে বালির চরে। খুব মেজাজ দেখিয়েছে লোকটা। বলেছে মেমসাহেব তাকে যা করতে বলেছিল তা করা হয়নি বলে কমপ্লেন করে গিয়েছেন। তার ফলে স্যাণ্ডি নেস্ট হোটেলে আর কখনও তাকে কাজ দেওয়া হবে না। শুনবার পর ভদ্রর ওপরে খেপে উঠেছিল রোগা রায়। এখন প্রশ্নটা শুনে খেঁকিয়ে উঠল।

'ওকেই চাই ভাই। খুব দরকার।' লোকটি জবাব দিল।

"অন দি সি' হোটেলে চলে যান। সাহেব সেখানে ফুর্তি মারছেন।'

রোগা রায় আর দাঁড়াল না। বাড়ি ফিরে সে অবাক হয়ে গেল। সরলাবালা বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে। বউ বেঁচে থাকতেও সরলা-বালা কখনও এই বাড়িতে ঢোকেনি। সে দ্রুত কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? আজ কোনদিকে সূর্য উঠল?'

সরলাবালা ম্লান হাসল, 'মেয়ে কোথায়?'

'তাকেই তো খুঁজে মরছি। বিচে এখন মেলা বসে গেছে। সেখানে সেঁধিয়ে থাকলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তোমার ছেলেকে মাথায় করে নাচবে সবাই আজ।'

মাথায় করে নাচার হলে তো নাচবেই। আগামী কাল ভাল সময় আছে। পুরুতঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। কি ভাবলেন বলুন।' সরলাবালা সরাসরি বলল।

রোগা রায় ভুলছিল, 'মেয়ে বড় হয়েছে। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। কিন্তু দেখা পেলে তো! আমার অবশ্য খুব আপত্তি নেই। তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা হবে, নিত্য দেখা পাব।'

'কথা হচ্ছে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের। আমার দেখা পাওয়ার কথা উঠছে কেন?' সরলাবালার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে যাচ্ছিল রোগা রায় কিন্তু তার আগেই সাইকেলের ঘন্টি বাজল। একটা ছেলে এসে বলল, 'জ্যেঠা, টুকু খড়্গপুর চলে গেছে।'

'টুকু? সেখানে কি ব্যাপার? মানে?' রোগা রায় সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'জানি না। বাসে ওঠার সময় আমাকে এই চিঠিটা দিয়ে বলল পৌঁছে দিতে।' ছেলেটি একটা কাগজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। রোগা রায়ের সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সরলাবালা উঠে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎই যেন লোকটাকে রক্তশূন্য মনে হচ্ছে। মুখ ভেঙে যাচ্ছে। মাথা নিচু হয়ে এল কাগজটা পড়ার পরে। ধীরে ধীরে দাওয়ায় বসে পড়ল রোগা রায়। সরলাবালা তার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? অমন করছেন কেন?'

হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রোগা রায়। দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল মুখ। কথা বলার চেষ্টা করল। আর সে যখন এমন আচরণ করছিল তখন সরলাবালার বুকে বেড়াল আঁচড়াচ্ছিল। এ রোগা রায়কে সে চেনে না। চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রোগা রায় একসময় বলল, 'মেয়ে আমার চলে গেছে গো। সে তার জীবনসঙ্গীকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। আমাকে খোঁজ করতে নিষেধ করেছে। আর যাওয়ার সময় ওর বিয়ের জন্যে যা জমিয়েছিলাম তাও নিয়ে গিয়েছে।'

সরলাবালা মুখে হাত চাপা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল ঘটনাটা তো ভদ্রর সঙ্গে বিয়ের পরেও হতে পারত। তাহলে? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। রোগা রায় তখন প্রলাপ বকছে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কত কষ্ট করে ওই মেয়েকে বুকে আগলে বড় করেছে আর

তার এই প্রতিদান। কান্নার শব্দে আকর্ষিত হয়ে একটু একটু করে ভিড় জমছে। সবাই সরলাবালাকে জিজ্ঞাসা করছে কি হয়েছে? সরলাবালা দুটি শব্দ বলল, 'মেয়ে পালিয়েছে।' আর সেটা শোনামাত্র মাথা ঠুকতে লাগল দেওয়ালে রোগা রায়। বাধা দিতে গেল সরলাবালা, 'কি হচ্ছে, অ্যাঁ? পুরুষ মানুষের এমন করতে নেই।'

'আমার আর কেউ রইল না গো।' কান্নার দমকে হাত চেপে ধরল রোগা রায়, 'বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে চলে গেল। তোমার ছেলে যাচ্ছে জানিয়ে-শুনিয়ে। আমার মেয়ে গেল চোরের মত।'

হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁটা উঠল সরলাবালার। কিন্তু এই মুহূর্তে রোগা রায়ের হাতের মুঠো থেকে নিজের কব্জি মুক্ত করার শক্তি সে পাচ্ছিল না।

ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরেছিল ভদ্র। অনন্ত বিশ্বাস ওসব পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন, সে যেন ঘরে অপেক্ষা করে। তিনি নিজের গাড়িতে চাপিয়ে সভায় নিয়ে যাবেন। বাঙালীর ছেলেকে ধুতি পরা দেখলে সবাই খুশি হবে তাই চেষ্টা করেও যেন ভদ্দর ধুতি পরে। বিশাল আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল ভদ্র। যদিও ধুতিটা একটু লটপট করছে তবু দেখতে খুব খারাপ লাগছে না।

এই সময় দরজায় টোকা পড়তেই সে সচেতন হল। এইবার যাওয়ার সময় হয়েছে। কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল তার। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলতেই অবাক হল ভদ্র, দুটো অচেনা লোক তাকে নমস্কার করছে। কপালে হাত ঠেকিয়ে ভদ্র জানতে চাইল, 'কাকে চাই?'

'আপনি ভদ্রবাবু?' বিনীত গলায় বলল একজন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কেউ তাকে আজ পর্যন্ত বাবু বলেছে বলে মনে পড়ে না।

'ভেতরে আসতে পারি? দু মিনিটের বেশি কথা বলব না।'

বেশ অবাক হয়ে সরে দাঁড়াতেই লোক দুটো ভেতরে ঢুকে চেয়ারে বসল। দাঁড়িয়েই ভদ্র জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন? আপনারা কে? মানে, আমি কখনও দেখিনি তো!'

'না না। আমাদের দেখবেন কি করে। খবরের কাগজে জেনে ছুটে এলাম। আপনি তো সমুদ্র পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন। কোন রুটে যাচ্ছেন তাও জেনেছি। খুব সাহসের কথা। বাঙালীর ছেলের তো সাহসটাই কমে গেছে আজকাল। ভাল, ভাল।' প্রথমজন বলল।

দ্বিতীয়জন বলল, 'আমরা ভাবলাম আপনার সঙ্গে কথা বলা যাক। যদি আপনি কোন পরিশ্রম না করে অর্থ উপার্জন করতে চান, এই ধরুন হাজার দেড়েক টাকা তাহলে একটা ব্যবসায়িক কথাবার্তা শুরু করা যেতে পারে।'

'পরিশ্রম না করে টাকা? সে আবার কি?' মজা লাগছিল ভদ্রর।

'মাছ ধরতে তো পরিশ্রম হতো আপনার। মাছ পেতেন। আবার নাও পেতেন। এখানে সে অনিশ্চয়তা নেই। কিন্তু একটা শর্ত আছে। রাজি থাকলে এই সব কথা আর কাউকে বলতে পারবেন না। এমনকি যে তিনজন আপনার সঙ্গে যাচ্ছে তাদেরও না।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'ওই তো, বললাম, যদি রাজি থাকেন তাহলেই বলতে পারি। ব্যাপারটা পাঁচ কান হলে আপনার বিপদ, আমাদেরও।'

'এর মধ্যে বিপদ আছে নাকি?'

'খুব সামান্য। এক পার্সেন্ট। আপনাকে তো কেউ সন্দেহ করবে না, সেইটে সুবিধে।'

'ঠিক করে বলুন তো কাজটা কি?' খুব কৌতূহল হচ্ছিল ভদ্রর।

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তাহলে কথা দিচ্ছেন পাঁচ কান করবেন না!'

'বেশ।'

'ব্যাপারটা হল যেদিন আপনারা নৌকো ভাসাবেন সেদিন আপনাকে আমরা একটা গিফটের প্যাকেট পৌঁছে দেব। প্যাকেটটি আপনার নিজস্ব জিনিসপত্রের মধ্যে রেখে দেবেন। হয় তার পরের দিন নয় দু'দিন বাদে সমুদ্রে কোন জাহাজ থেকে কিছু লোক আপনাদের অভিনন্দন জানাতে আসবে। তখন কেউ যদি বলে আপনাকে 'দিয়ে দিন' তাহলে

তার হাতেই প্যাকেটটি দিয়ে দেবেন। কোন পরিশ্রম নেই, বিপদ নেই। দেড় হাজার টাকা যখন প্যাকেট দেব তখনই পেয়ে যাবেন। বলুন এবার।'

'প্যাকেটে কি আছে?' ভদ্রর ঔৎসুক্য বাড়ছিল।

'সামান্য কিছু উপহার।'

'উপহার পৌঁছে দেবার জন্যে—।' ভদ্র ঢোঁক গিলল, 'বেশ, আমি কাউকে বলব না, শুধু যারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের—।'

'না, কাউকে নয়। এ ব্যাপারে গোপনীয়তা না থাকলে আপনার চূড়ান্ত ক্ষতি হবে। হয়তো আপনার সমুদ্রে যাওয়াই হবে না। কথার খেলাপ করবেন না।' লোকটার গলার স্বর পাল্টাচ্ছিল।

হঠাৎ ভদ্রর মনে হল ব্যাপারটা সহজ নয়। যারা তাকে পয়সা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে মিথ্যে বলতে পারবে না। কিছু না বলাটাও তো এক ধরনের মিথ্যে বলা। তাছাড়া সমুদ্রে একটা নৌকো ভাসছে। সেটাকে খুঁজে পেতে কেন কেউ বলবে দিয়ে দিন? নিশ্চয়ই ওই প্যাকেটের মধ্যে এমন কিছু থাকবে যা দেড় হাজার টাকার চেয়ে অনেক দামী। ভদ্র নিজের মনে মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি পারব না।'

'কেন? এতে অসুবিধে কোথায়? ঠিক আছে দু হাজার।'

'বলেছি তো আমি পারব না। আমি একবার না বললে হ্যাঁ বলি না।'

'হুম্। এখনও টাইম আছে। ভেবে দেখুন ভাই। তবে হ্যাঁ, যদি কথাটা লিক হয়ে যায় দলের লোকেরা তোমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে! সব জায়গায় আমাদের চোখ আর কান আছে।' লোকটা কোনমতে রাগ চাপছিল। আর তখনই দরজা খুলে দড়াম করে অনন্ত বিশ্বাস ঢুকে পড়লেন ঘরে, 'চল হে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তারপরেই ঘরে দু'জন মানুষকে দেখে অবাক হলেন। ভদ্র কিছু বলার আগে লোক দুটো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি আজ।'

অনন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? আমি তো আপনাদের, মানে—।'

'আমরা কলকাতা থেকে এসেছি।' দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'সাংবাদিক। ভদ্রবাবু সমুদ্রে যাচ্ছেন। ওঁর ইন্টারভিউ নিলাম। তাছাড়া

প্রস্তাব দিলাম ফিরে এসে যদি এই সমুদ্রযাত্রার বিবরণ শুধু আমাদের কাগজের জন্যে বলেন—।'

'বাঃ বাঃ। খুব ভাল কথা। আমি অনন্ত বিশ্বাস। আমার সঙ্গে আপনাদের আলাপ হওয়া দরকার। আজকের সম্বর্ধনা আমিই অর্গানাইজ করছি। আসলে আমি হলাম ওর গড ফাদারের মতন। এসব কথা না বসে বলা যাবে না। আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন? মিটিংটা দেখুন। তারপর আমার অতিথি হয়ে এই হোটেলে রাতটা থাকুন। তখন সব বলব।' সাংবাদিকদের পেয়ে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন অনন্ত বিশ্বাস।

লোক দুটো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ভদ্র হতভম্ব হয়ে ওদের দেখছিল। এই লোক দুটো আচমকা এমন কথা বলতে আরম্ভ করেছে যা শুনে অনন্ত বিশ্বাস খুব খুশি হয়েছেন। কথাগুলো তার মাথায় পরিষ্কার ঢুকছে না। অনন্ত বিশ্বাস আজ বলছেন, 'না না, আপত্তি করবেন না। আপনাদের যত্নআত্তির কোন ত্রুটি রাখব না। আপনারা আজকের রাতটা থেকে যান।'

একজন যেন অনিচ্ছায় রাজি হল, 'ঠিক আছে। যখন বলছেন—!'

দ্বিতীয়জন বলল, 'তাহলে এক কাজ করা যাক। আমরা বাকি কাজ সেরে সোজা জনসভায় চলে যাচ্ছি। এলাম ভদ্রবাবু, আবার দেখা হবে।'

লোক দুটো চলে যাওয়া মাত্র অনন্ত বিশ্বাস প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'সব ঠিকঠাক হচ্ছে। কপালে বিঘ্ন না থাকলে সুবোধ মাইতি তোমাকে আমি এবার দেখে নেব। ওহো, হ্যাঁ, চল, চল।' ভদ্রর হাত ধরে টানতে টানতে তিনি করিডোরে বেরিয়ে এলেন। কয়েক পা হেঁটেই আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, 'শোন, আজকের সভায় আর সাংবাদিকদের কাছে কি বলবে ঠিক করেছ?'

'সাংবাদিক কি জিনিস?'

'ওঃ। সাংবাদিক হল যারা সংবাদপত্রে লেখে। শোন, তুমি বলবে তোমার সাঁতার শেখার অনুপ্রেরণা মানে উৎসাহ তুমি পেয়েছ অনন্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে। তোমাকে ফার্স্ট হওয়ার পর উপহার দিয়েছিলাম,

দিইনি? হ্যাঁ। তারপর বলবে এই যে সমুদ্রযাত্রা, তা সবই অনন্ত বিশ্বাসের জন্যেই হচ্ছে। বলবে, ওঁর কাছে না গেলে কেউ বুঝবেন না যে কত বড় দরাজ মনের মানুষ উনি। মনে থাকবে?' কাতর চোখে তাকালেন অনন্ত বিশ্বাস।

ঘনঘন মাথা নাড়ল ভদ্র। একটু সন্দেহ হল অনন্ত বিশ্বাসের। বললেন, 'ঠিক আছে, মঞ্চে ওঠার আগে আর একবার মনে করিয়ে দেব। ওই যা, ওই মেয়েটাকে তো ডাকতে হবে। তুমি যাও, রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ডেকে আনছি।'

নিচে নামতেই রিসেপশনের বাইরে প্রচুর লোককে অপেক্ষা করতে দেখল সে। তাকে দেখামাত্র সবাই চিৎকার করে উঠতেই প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল ভদ্র। এই সময় সে তিস্তাকে এগিয়ে আসতে দেখল, 'বাঃ! একদম জামাই সাজ! এসব কিন্তু সমুদ্রে একদম চলবে না।'

ভদ্র লজ্জিত গলায় বলল, 'জানি।' সে আড়চোখে দেখল তিস্তা শাড়ি পরেছে। ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ি। দারুণ দেখাচ্ছে। তিস্তা বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার! এত লোক যে তোমাকে দেখতে চাইছে ভাবা যায় না!'

এই সময় হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন অনন্ত বিশ্বাস, 'ওহো আপনি নিচে! আমি এদিকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চলুন চলুন। ডি এম, এসে গেলেন বলে।'

কোনমতে পথ করে নিয়ে অনন্ত বিশ্বাস দুজনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। ভদ্র দেখল বালিবাসা এবং ফারগঞ্জের কিছু ছেলে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে গেছে এর মধ্যে। 'অন দি সি' হোটেল থেকে সমুদ্র বেশি দূরে নয়। কিন্তু শ'খানেক ছেলেদের চিৎকার সঙ্গে নিয়ে ওরা প্রায় বিচের কাছে চলে এল যে পর্যন্ত গাড়ি যেতে পারে। ভদ্র গাড়ির ভেতরে কুঁকড়ে বসেছিল। তার একপাশে অনন্ত বিশ্বাস, অন্যপাশে তিস্তা সেন। তিস্তা ওর মুঠো ধরল, 'এত নার্ভাস হলে সমুদ্র ডিঙোবে কি করে? চোখ মেলে দ্যাখো সিনেমা স্টারের জন্যে এত ভিড় হয় না।' গাড়ি থেকে নেমে প্রায় মাথা ঘুরে গেল ভদ্রর। সমস্ত বালির চর কালো মাথায় ছেয়ে গেছে।

পড়বেন। তিনি আমাদের প্রধান অতিথি। তিনি এলেই হৈ-চৈ উঠল। অনন্ত বিশ্বাস কথা থামিয়ে ডানদিকে ডি. এম.-কে দেখতে পেলেন। স্বেচ্ছাসেবীরা ডি. এম.-কে তিনি একবার নামতে গিয়েও মত পরিবর্তন করলেন। রিলে করার গলায় বলে যেতে লাগলেন, 'মাননীয় ডি. এম এই-মাত্র এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সময়জ্ঞান যে কত প্রখর তার পেলাম। এটা শেখার বিষয়। তিনি আসছেন মঞ্চের সেবীরা তাঁকে পথ করে দিচ্ছেন। এত কাজের মধ্যেও করে আসতে পেরেছেন সেই কৃতজ্ঞতায় তিনি মঞ্চে উঠে তাঁকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাব। আমাদের এখন প্রায় মঞ্চের কাছে এসে পড়েছেন। তিনি সিঁড়ি বেয়ে ভাইসব, সবাই হাততালি দিন।'

করতালির শব্দ সমুদ্রের গর্জনকে ম্লান করে দি[illegible] উঠে ডি. এম. বললেন, 'আরে কি আরম্ভ করেছেন অনন্তবাবু [illegible]

অনন্ত করজোড়ে বললেন, 'শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা জান[illegible]স্যার?'

ডি. এম. মাইকেলসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে[illegible]ন আছেন?'

মাইকেলসাহেব ঘাড় নেড়ে ভাল বলতেই [illegible]মনের দিকে তাকালেন, 'কি মারাত্মক ব্যাপার! এত লোক বা[illegible]ছিল?'

অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'এই জনতা এর আগে[illegible]হয়নি।'

'দ্যাটস রাইট। নিন শুরু করুন। আমার আ[illegible]র একটা মিটিং আছে।'

অনন্ত বিশ্বাস মাইকের দিকে এগিয়ে যেতে গি[illegible]জেকে সংবরণ করে মাইকেলসাহেবকে ইঙ্গিত করলেন সভা শুরু[illegible]। তারপর ডি. এম.-এর পাশের চেয়ারে বসে নিচু গলায় ক[illegible]তে লাগলেন। মাইকেলসাহেব বললেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা সব[illegible]ন কেন আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। তিনজন দামাল শহু[illegible]ময়ে পরিকল্পনা করেছে এখান থেকে সমুদ্রে নৌকো ভাসাবে। প্র[illegible]জার তিনশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পথ ওরা নৌকো বাইবে। [illegible] বারংবার ঝড়

উঠবে, সামুদ্রিক হিংস্র জন্তুর সামনে পড়তে হবে। হয়তো এক বছর লেগে যেতে পারে সময়। পথ ভুলে গেলে তো কথাই নেই। তবু ওরা যাচ্ছে। এককালে এই বাংলার মানুষ হেলায় লঙ্কা জয় করেছিল। আজ সেই রকম ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এই যাত্রায় চতুর্থ সঙ্গী হিসেবে এঁরা নির্বাচন করেছেন আমাদের ঘরের ছেলে ভদ্র দাশকে। আপনারা জানেন ভদ্র সমুদ্রকে ভয় পায় না। সে সমুদ্রকে জয় করতে চায়। এই সমুদ্র বালক বয়সে তাকে চরম দুঃখ দিয়েছিল। তার বাবাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আমি জানি ও স্বপ্ন ছাখে এই সমুদ্র ডিঙিয়ে যাওয়ার। সেই সুযোগ আজ এসেছে। বালিবাসার ছেলে ভদ্র আজ যে দুঃসাহসিক কাজে নামছে তার কোন তুলনা নেই। আসুন তাকে আমরা হাততালি দিয়ে আমাদের সমর্থন জানাই।' প্রচণ্ড শব্দ বাজল কিছুক্ষণ। মাইকেলসাহেব এরপর অনন্ত বিশ্বাসকে বলতে বললেন।

অনন্ত বিশ্বাস এগিয়ে এসে দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'আমি সামান্য মানুষ। ভদ্দরকে দেখেছি এইটুকু থেকে। তখনই জানতাম ও অনেক বড় হবে। আজ ও সমুদ্রে যাচ্ছে জেনে বলেছি তুমি তোমার কাজ করে যাও। আমাদের বালিবাসার মুখ যদি উজ্জ্বল করতে পার তাহলে তুমি যা চাও তাই পাবে। কিন্তু কি দিতে পারি আমি। সামান্য একটি মানুষের কি দেওয়ার শক্তি থাকতে পারে? জানি না। শুধু জানি বালিবাসা ফারগঞ্জের যে কোন ছেলে-মেয়ে যদি এমন কিছু করে যা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করছে তবে তাকে আমার কিছুই অদেয় থাকবে না।' এইখানে দম নেওয়ার জন্যে থামতেই অনন্ত বিশ্বাস বিপুল হাততালি শুনতে পেলেন। তিনি একটা হাত তুললেন, 'আমার কথা থাক। ভদ্র দাশের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা বালিবাসার সবার। ফারগঞ্জ থেকেও মানুষজন এসেছেন। কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুবোধ নাইতি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেননি। আমি নিজে গিয়েছিলাম ওঁর বাড়িতে। বললাম, যত কষ্ট হোক একবার ছেলেটাকে আশীর্বাদ করে আসুন। কিন্তু শরীর তাঁর এত খারাপ যে আসতে পারলেন না। তাঁকে না দেখে আপনারা দয়া করে ভুল বুঝবেন না। যা

হোক, ভদ্র দাশ জয়যুক্ত হয়ে ফিরে আসুক এই কামনা করছি। নমস্কার।' আবার হাততালি পড়ল। কিন্তু সেই সঙ্গে জনতা গুনগুনিয়ে উঠল, 'আজ সকালেও সুবোধ মাইতিকে রাস্তায় দেখা গেছে', 'সুবোধ মাইতি দুপুরে মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়েছিল', 'লোকটা ইচ্ছে করে এখানে আসেনি'।

মাইকেলসাহেবের অনুরোধে ডি. এম. উঠলেন, 'আমাদের ছেলে-মেয়েরা যত দুঃসাহসী হবে তত ভাল। এই অভিযানে একজন তরুণী অংশ নিচ্ছেন। খুব ভাল। এই দৃষ্টান্ত মেয়েদের নিশ্চয়ই উজ্জীবিত করবে। নমস্কার।' বক্তৃতা শেষ করে ডি. এম. চলে গেলেন। ওঁর যাওয়াটা অবশ্য অনন্ত বিশ্বাস রিলে করে না শুনিয়ে নিজেই মঞ্চ থেকে নেমে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন।

সভা যখন সাঙ্গ হল তখন সন্ধ্যা নেমেছে বালিবাসায়। গাড়িতে বসেও হাঁটু কেঁপে চলেছিল ভদ্রর। মাইকের সামনে তাকে যখন মাইকেল-সাহেব কিছু বলতে বলেছিলেন তখন জিভ কাঠ এবং হাঁটু নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের বড় ঢেউ-এর সামনে গিয়েও তার হৃদয়ে এতটা আতঙ্ক প্রবেশ করে না। কোনরকমে হাত তুলে নমস্কার বলতেই যে হাততালি উঠেছিল তাতেই সে ফিরে গিয়েছিল চেয়ারে। অবস্থা বুঝতে পেরে মাইকেলসাহেব ডেকেছিলেন তিস্তাকে। তিস্তা উঠে সহজ গলায় তাদের অভিযানের উদ্দেশ্য, কোন পথে যাবে, কেন একজন স্থানীয় উদ্যমী যুবককে নেওয়া হল তা বুঝিয়ে বলেছিল। হাততালি সে কম পায়নি।

হোটেলে ফিরে আসার পর অনন্ত বিশ্বাস খুব খুশি। পাবলিক এখন তার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। বালিবাসা ফারগঞ্জের অন্তত নব্বুই ভাগ ভোট আগামী নির্বাচনে তাঁর পকেটে। এখন যদি এই হতভাগারা জয়-যুক্ত হয়ে ফিরে আসে তাহলে তো কথাই নেই। খাওয়ার টেবিলে বসে তিনি বললেন, 'বুঝলে ভদ্র, বক্তৃতা করা সাঁতারের চেয়েও শক্ত ব্যাপার। আগেকার দিনে বিয়ের আগে বরের পা কাঁপতো, তুমি তো তাকেও হারিয়ে দিলে হে।'

তিস্তা বলল, 'ওর বিয়ের ব্যাপারটা কি হল?'

অনন্ত বিশ্বাস বললেন, 'সমাধান হয়ে গেছে। ফিরে না এলে ওকে

কেউ বিয়ে করবে না।'

প্রথম রাত্রে ঘুম এসেছিল অনেক দেরিতে অনভ্যস্ত পরিবেশের জন্যে। আজ ঘুম আসছিল না কিছুতেই অন্য কারণে। বিকেল বেলায় এত লোকের হাততালি, সহস্র সহাস্য মুখ দেখে সে যতটা পুলকিত ততটা বিষাদগ্রস্ত। চেয়ারে বসে মঞ্চের ওপর থেকে অনেক চেষ্টা করেও মায়ের মুখ দেখতে পায়নি। তাকে নিয়ে এমন ঘটনা ঘটছে বালিবাসায় অথচ মা আসবে না এ হতে পারে না। আর মা এলে সামনে বসত।

আরামদায়ক বিছানায় ভদ্র দাশ ছটফট করছিল। সেই সঙ্গে অনন্ত বিশ্বাসের হাসিটা তার মাথায় চেপে বসেছিল, 'সমাধান হয়ে গিয়েছে। ফিরে না এলে ওকে কেউ বিয়ে করবে না।' কেন বলল এই কথা? কিসের সমাধান? শেষ পর্যন্ত আর পারল না ভদ্র। জামা গলিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে বের হল। করিডরে অল্প আলো জ্বলছে। কোথাও কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। এখন মধ্যরাত। তিস্তার ঘরের দরজা বন্ধ। সে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। এই রাত্রে হোটেলের সদর দরজা বন্ধ। খোলাতে গেলে ডাকাডাকি করতে হবে। তাতে কি বিপত্তি হয় তা কে জানে! সে আবার দোতলার ব্যালকনিতে ফিরে এল। নিচের বালি চোখে পড়ছে আবছা। দূরত্বটা মেপে নিয়ে ভদ্র লাফিয়ে পড়তেই কুকুর ডেকে উঠল। বালি থেকে পা ছাড়িয়ে সে হাঁটা শুরু করল। মাঝ রাতে চাঁদ না থাকলে সমুদ্রের চেহারা বেশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কোন দৃশ্য দেখা যায় না। কালো ছায়া অস্পষ্ট নেচে যায় কিন্তু তার গর্জন ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে উত্তাল বাতাস। এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে ভদ্র ছুটতে শুরু করল। মধ্যরাতের বালি-বাসার রাস্তায় কুকুর ছাড়া কেউ জেগে নেই। ছুটন্ত মানুষের পিছু তাড়া করে তারা হার মানলেও চিৎকার থামাচ্ছে না।

বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। অন্ধকার স্বাভাবিক কিন্তু দরজায় তালা কেন? দাওয়ায় উঠে সে তালাটা স্পর্শ করল। এই ঘরে রাতে কখনও তালা পড়ে না। মা কোথায় গেল? ব্রজকাকার ঘর

খানিকটা বাঁ-দিকে। হঠাৎ তার দরজা খুলল। লণ্ঠন হাতে কেউ বের হল সেখান থেকে। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। ব্রজকাকা একা নয়। সঙ্গে কেউ আছে, ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ব্রজকাকাকে। যে নিয়ে যাচ্ছে সে বলল, 'সন্ধ্যে থেকে এই নিয়ে চারবার হল, ওষুধ পেটে পড়ছে না। পড়লে ধরে যেত।'

ব্রজকাকা খিঁচিয়ে উঠলেন, 'যার পেটে খাদ্য পড়ে না তার আবার ওষুধ। সে হারামজাদা এখন হোটেলে আরাম মারছে। ওর বাপ থাকলে এভাবে ফেলে যেতে পারত?' কাকিমার গলা বাজল, 'হাজার বার এক কথা বল। পেটের ছেলে মাকে দেখল না তো তুমি কে? ওর বাপের সঙ্গে ওর তুলনা? শত্তুর শত্তুর।'

ওরা মাঠের দিকে চলে যাওয়ার পর সম্বিৎ পেল ভদ্র। রাত-দুপুরে পাড়া-প্রতিবেশীকে জাগিয়ে মায়ের খবর জিজ্ঞাসা করার চাইতে ব্রজ-কাকার মেয়েকে—। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করল সে। ওরা তাকে শত্রু ভাবছে এখন।

হঠাৎ বাসন্তীর মুখ মনে এল। বাসন্তীর মায়ের কিছু হয়নি তো? বাসন্তীকেও তো সে সভায় দেখতে পায়নি। শত্তুর শত্তুর। শব্দ দুটো কানে সেঁটে বসেছে। ব্রজকাকা, কাকিমা, বাসন্তী কিংবা মা, এরা কেউ তার সভায় যায়নি। সে কি সবার শত্রু?

বাসন্তীদের ঘরে কুপি জ্বলছে। সেই সঙ্গে সেলাই মেসিনের আওয়াজ। ভদ্র একমুহূর্ত আঁচ করার চেষ্টা করল। তাহলে ওর মায়ের কিছু হয়নি। দাওয়ায় উঠে নিচু গলায় ডাকল সে, 'বাসু।' অমনি শব্দটা থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপচাপ, তারপর বাসন্তীর গলা বাজল, 'কে?'

'আমি ভদ্দর।'

একরাশ ছায়া শরীরে নিয়ে বাসন্তী দরজায় এসে দাঁড়াল, 'কি চাই?'

'মা, মায়ের খবর জানো?'

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মা খড়্গপুরে গিয়েছে বলে শুনলাম।'

'খড়্গপুরে?' চমকে উঠল ভদ্র, 'কেন? সেখানে তো আমাদের কেউ নেই।'

...নেহ বলে কি নতুন করে হতে পারে না? তুমি জানো না?'

...মা। কখন গেল? কেন গেল?'

'অত জানি না। শুনলাম রোগা রায়ের মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছে।'

'রোগা রায়ের মেয়ে? সে কেন ওখানে?'

'লোকে বলছে সে গিয়েছে ঘর বাঁধতে। তোমার মা আর রোগা রায়দের ঘর বাঁধা হবার আগেই ধরে নিয়ে আসতে গিয়েছে।'

'কেন?'

'সাগরে যাওয়ার আগে তোমার যে একটা বউ চাই!' কথাটা বলেই জোরে কেঁদে উঠল বাসন্তী। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই কান্না বহুগুণ বেড়ে ...শে ছড়িয়ে পড়তেই মানুষের গলার আওয়াজ শুরু হল। বিব্রত ...লে উঠল, 'আরে কাঁদছ কেন?'

...কন্তু ততক্ষণে কুপির সামনে বসে পড়েছে বাসন্তী। সমস্ত শরীর থেকে তার কান্না ছিটকে ছিটকে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমতে লাগল। পাড়ার লোকেরা ভদ্রকে সেখানে দেখে অবাক। কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমায় খবর দিল কে? কখন হল?'

হতভম্ব ভদ্র আবিষ্কার করল বাসন্তীর মা গত হয়েছে। অন্ধকার রাত্রে একাকী মৃত মায়ের শরীর পাশে নিয়ে মেয়েটা সশব্দে মেশিন ...লিয়ে সেলাই করে যাচ্ছিল কি কারণে? আর ভদ্রকে খবর দিয়ে যে কান্না ছিটকে উঠেছিল ওর গলা থেকে সেটা কার উদ্দেশে? কার কারণে?

যে শোক বহু প্রত্যাশিত থাকে তার ধার কিংবা ভার দর্শককে বেশিক্ষণ টানে না। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিবেশীরা ফিরে গেল যে যার ঘরে। কাল সকালের আগে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া যাবে না। শুধু দরজায় ...সে বাসন্তী ফুঁপিয়ে যেতে লাগল। এর মধ্যে ভদ্র দাশ ছুটে গিয়েছিল রোগা রায়ের বাড়িতে। সেখানেও তালা ঝুলছে। খড়্গপুরের ফার্স্ট বাস ...লিবাসায় পৌঁছয় সকাল সাড়ে সাতটায়। মা ফিরলে তার আগে নয়। সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়ে ভদ্র দেখল নৌকো-জাল নিয়ে দলে দলে

মানুষজন সমুদ্রে নামছে। ভোরের আগেই ঢেউ ভেঙে ভেঙে ওর চলে
যাবে যতদূর না মাইকেলসাহেবের হোটেলের মাথায় টাঙানো প কতাকা
দেখা যায়। সমস্ত শরীর নিংড়ে পরিশ্রম করে যাবে মাছ তুলতে। শুধু
জলের ওপর ভেসে ভেসে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে স র্ধনা
পাওয়া যায় কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না। জলের নিচের রহস্য চিরব
অজ্ঞাত থাকে তাহলে। মাছ যেমন ওঠে সঙ্গে এমন অনেক প্রাণী ওঠে
আসে যাদের আগে কখনও দ্যাখেনি সে। একবার একটা বাচ্চা অক্টোপাশ
উঠে এসেছিল জালে। তীরে আসার আগে সেটার অস্তিত্ব টের পায়নি
সে। এই সব ভাবতে ভাবতে সমুদ্র তাকে টানতে শুরু করল। নৌকো-
গুলো এগোচ্ছে একটার পর একটা। প্রতিটিতে ঠিকঠাক মানুষ, কে
চাইলেও অতিরিক্ত ওজন সহ্য হবে না। শরীর বেঁকিয়ে সে আবার
পাড়ার দিকে ছুটল।

'চারবার পায়খানা করেছ তবু দম ফুরোয় না। না খেয়ে মর তবু
ঘরে থাক।'

কাকিমার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর কানে এল। ব্রজকাকা মিনমিন করলেন.
'বেশি দূর যাব না, কাছে-পিঠে জাল ফেলব, হাতজাল। যা ওঠে।'

'তুমি গেলে আমি গলায় দড়ি দেব।' বলেই কাকিমার গলা উঁচুতে
উঠল, 'কে? এত রাতে দাওয়ায় কে? কথা বলছে না কেন? 'কে
ওখানে?'

'আমি ভদ্দর।'

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপচাপ। শেষ পর্যন্ত ব্রজকাকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি
চাই?'

'নৌকো আর জালটা।'

তারপরে একটি অদ্ভূত ঘটনা ঘটল। চারবারে দুর্বল হয়ে যাওয়া
মানুষ ব্রজকাকা ভদ্রর পিঠে জাল চাপিয়ে হাঁটতে লাগলেন চুপচাপ।
এই যাওয়ার প্রস্তুতিতে কেউ কোন কথা বলেনি। এমন কি কাকিমাও
নয়। শুধু শেষ মুহূর্তে মৃদু গলায় জানতে চেয়েছিলেন, 'পেটের অবস্থা
ভাল নয়, যদি নৌকোয় পায়?' 'সমুদ্র আছে। অতবড় সমুদ্র, জায়গার

অভাব!' উত্তর দিয়েছিলেন ব্রজকাকা। প্রতিটি মুহূর্তে ভদ্র আশঙ্কা করছিল ব্রজকাকার মুখ থেকে গালাগালি বের হবে। অথচ নৌকো টেনে ভারী জাল নিয়ে গিয়ে চেপে বসা পর্যন্ত কোন শব্দ নয়। আজ ব্রজ-কাকার শরীরের জন্যেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে ভদ্রকে। কিন্তু তার ভাল লাগছিল। জাল ফেলার জায়গা খুঁজতেই ব্রজকাকা বললেন, 'এখানে নয়।' আরও এগিয়ে ভদ্রর মনে হল একটা ঝাঁক জলে ঘুরছে। ব্রজকাকা বললেন, 'এখানে নয়।'

ভদ্র কোন কথা বলছিল না। ক্রমশ অন্য নৌকোর পাশে এসে গেল তারা। আবছা অন্ধকারে প্রশ্ন এল, 'কার নৌকো?'

'ব্রজ দাশ। সঙ্গে আছে ভাইপো ভদ্দর দাশ যার বাপকে সাগর খেয়েছে।'

তৎক্ষণাৎ সবাই অবাক! যাকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় এত হৈচৈ সে এসেছে মাছ ধরতে! জালে হাত দিতেই ভদ্র শুনতে পেল, 'এখানে নয়।'

একসময় ওরা যেখানে উপস্থিত হল সেখান থেকে মাইকেলসাহেবের পতাকা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ব্রজকাকা বললেন, 'রোগা রায়ের সঙ্গে তোর মায়ের যাওয়াটা ঠিক হয়নি ভদ্দর। মেয়ে খুঁজতে গিয়ে রোগা রায় যদি তোর মাকে নিয়ে না ফিরে আসে তাহলে বংশের মুখে কলঙ্ক পড়বে। আর পালিয়ে যাওয়া মেয়েকে ঘরের বউ করে কেউ? বাসন্তীকে তোর বাপ বউ করতে চেয়েছিল না?'

'চেয়েছিল।'

'মাছ ধরতে গিয়ে অক্টোপাশ ধরছে তোর মা। এখানে নয়, আরো আগে চল।'

'কাকা! পতাকা দেখা যাচ্ছে না আর।' চিৎকার করে উঠল ভদ্র।

'না দেখা যাক। এই রাস্তা দিয়ে তোরা অস্ট্রেলিয়ায় যাবি তো। দেখে আসি একটু।'

'কাকা, দিক হারিয়ে ফেলব এবার।' আঁতকে উঠল ভদ্র।

'হারানোর বাকি কি আছে! ঘরে বসে মরার চেয়ে একটু দেখে নিয়ে মরি।'

সমস্ত শরীর শীতল হয়ে গেল। হাওয়ার দাপটে ঢেউ উঠছে তিন তলায়। চৌদিক অন্ধকার। প্রাণপণে নৌকো সামাল দিতে চেষ্টা করছে ভদ্র। হঠাৎ মনে হল ব্রজকাকা মৃত্যুর মত সামনে বসে। একটু আগে দেখা বাসন্তীর মায়ের শরীর ব্রজকাকার চাইতে কম ভীতিপ্রদ। প্রাণপণে নৌকো ঘোরাতে চেষ্টা করছিল ভদ্র।

ব্রজকাকা বললেন, 'তোর বাপ এখানেই ডুবে মরেছিল গগনের সঙ্গে। পেট মোচড়াচ্ছে বড়। দাঁড়া, এই জায়গায় বাহ্যি করে দিই।'

ব্রজকাকা তাঁর আমাশার চাপ থেকে মুক্ত হচ্ছেন। নৌকো টলছে পাগলের মত। বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে ভদ্র দেখল টুপ করে পড়ে গেল মানুষটা। কোন রকমে হাত বাড়িয়ে ব্রজকাকাকে ধরল সে। রুগ্ন মানুষটা সেই ভয়ঙ্কর জলে নাকানি-চুবুনি খেতে খেতে চিৎকার করলেন, 'বাবা আমাকে বাঁচা।'

·

দিকভ্রান্ত ভদ্র নৌকোয় বসে। ব্রজকাকা কুঁকড়ে পড়ে আছে নৌকোয়। সমস্ত আকাশ আলোকিত করে সমুদ্র ভাসিয়ে সূর্য উঠছে। ভদ্র ভাবছিল কথাটা। মা যদি না ফেরে, যদি তিস্তাদের অভিযানে সে হাজির না হয়, যদি একলা বাসন্তী কোথাও উধাও হয়ে যায় তাহলেও জীবন ঠিকঠাক চলবে। কিন্তু মা এল, তিস্তারা তিনজনে পাড়ি দিল, বাসন্তী কেঁদে মরল, ব্রজকাকিমা মেয়েদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে থাকল দিনের পর দিন, তাহলে? তাহলেও জীবন চলবে। এই সময় চিঁচিঁ গলায় ব্রজকাকা বললেন, 'বাহ্যি করব।' চমকে উঠল ভদ্র। একটু আগে প্রায় মরে গিয়েছিল মানুষটা। জলের তলায় তলিয়ে গেলে এতক্ষণে আর বাহ্যি পেত না। অথচ যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ যন্ত্রণা, ততক্ষণ আশ।

সূর্যকে পেছনে রেখে নৌকো বাইতে বাইতে সে বলল, 'করুন, আমি ধরে আছি, আর পড়বেন না।'

ভাতারখাকী বলে বদনামের গল্প যার গায়ে তার কাছে অনেকেই ভনভনিয়ে আসবে এ আর নতুন কথা কি! তবে কিনা একটু আড়াল আবডাল, ধরি মাছ না ছুঁই পানির চোখধারা না থাকলে গাঁয়ে বাস করা যায় না। রাতবেরাতে কিছু ঘটলে ছেলেপুলের বাপ-মা সংসারী মানুষেরা জিভ নাড়তে পারে না, আবার দিনদুপুরে দেখা পেলেই বুকে বেড়াল আঁচড়ায়।

দৃষ্টান্ত তো ভুরিভুরি। মগরা স্টেশনের রেলের ছোটবাবু রসিয়ে হাত ধরেছিল, গেলবার থানার বড়বাবু নাকি ওকে জেরা করতে গিয়ে নিজেই জেরবার হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন ধরে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বাদলা রাত হলেই ওদিকে পা বাড়ান। অবিশ্যি এইসব গল্পগাছার ডানায় আর কতটা জোর, মুখ থুবড়ে একসময় পড়লই। তবে ওই যা, ছাই খুঁচিয়ে আগুন খোঁজার লোকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে। ফর্সা জামার তলায় ছেঁড়া গেঞ্জি যেমন জেনেও না জানা হয়ে থাকে তেমনি এইসব নিয়েই দিনরাত দিব্যি কেটে যায়। মুশকিল ঘটাল কয়েকটা ঘটনা।

হাত ধরার কয়েকদিনের মধ্যে রেলের ছোটবাবুই লাইন পেরোতে গিয়ে লোকালের চাকায় দু'টুকরো হয়ে গেল। রক্ত আর খুচরো পয়সায় চারদিক থই থই। কদিন আগে মাঝরাত্রে যখন আকাশ ঝমঝমিয়ে নামছে তখন ওই বাড়ির সামনে পা পিছলে ছাতি উল্টে পড়তে পড়তে সন্ন্যাস রোগে মুখ বেঁকে গেল পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের। বাঁ দিকটা অসাড়। দু-দুটো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দারোগাবাবুর যখন-তখন গাঁয়ে ঢোকা বন্ধ হয়ে গেল। চুল্লি জ্বলছে গনগনিয়ে কিন্তু শকুনের দেখা নেই। ভাতার মরলে যদি ভাতারখাকী তবে নাগর মরলে কি? তা একটা নয়, দু-দুটো। সন্ন্যাসে শুয়ে থাকা আর দু'টুকরো হওয়া তো

এক কথাই। অতএব ভাতারখাকী হল মরদখাকী। তল্লাটের সেরা মরদ দারোগাবাবুর প্রাণে তাই ভয় ঢুকেছে, তিনি আসেন না, নজরানা যায় ফি হপ্তায়। এ মন্দের ভাল। সামনে এলে যে সাতপ্যাঁচে অঙ্কটা বাড়তো তা সবাই জানে। তাই ভাতারখাকী বল আর মরদখাকী বল, পুরো গ্রাম-টাকে স্বস্তিতে রেখেছে যে তাকে চোখ রাঙাবে এমন সাধ্যি কার?

চোখ রাঙানো সইতে বয়েই গেছে আতরবালার। এই শ্রাবণে আটাশে পড়ল সে। 'বাপ নাম রেখেছিল বটে! যে দ্রব্য চোখে ছ্যাখেনি তার নামে নামকরণ! ভাতার বলত, 'আমি তোর তাই তুই আতর।' মরে যাই আর কি! এখন ছ্যাখো গ্রামটার চেহারা, যেন সবাই নেতিয়ে লেজ নাড়ছে পায়ের তলায়। আতর যদ্দিন আছে তদ্দিন উনুন ভাঙবে না, হাঁড়ি ওল্টাবে না। কথাটা সঠিক করে বললে বলতে হয় যদ্দিন ঠমক আছে তদ্দিনই আতরের সামনে লেজ নাড়া। তারপর আর একটা আতর তৈরী হয়ে যাবে ঠিক।

চুল বাঁধতে বাঁধতে আরশিতে মুখ দর্শন করল সে। রেলের ছোটবাবুর মনটা ভাল ছিল। যদি বল, বুঝলে কি করে তবে তার উত্তর একটা চাল টিপলেই তো বোঝা যায়। যে পুরুষ সোজা চোখে বুক ছ্যাখে অথচ তার দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি হয় না সে মন্দ লোক নয়। মরে যাওয়ার আগে কলকাতা থেকে রেলের ছোটবাবু এক শিশি এনে দিয়েছিল তাকে। হরিণের নাভি থেকে তৈরী আতর। দেবার সময় হাত ধরে বলেছিল, 'এখন মাখিস না। যেদিন আমার ফ্যামিলি থাকবে না কোয়ার্টার্সে সেদিন মেখে আসিস।' ওই হাতধরাটা দেখেছিল পাঁচজনে। দু'টুকরো হবার খবর পেয়ে যে কষ্ট হয়নি তা নয়, কিন্তু সে কারণেই শিশিটা খোলেনি এমন নয়। ইদানীং চিবুক বুকে ঠেকালে কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগে। এই যে এখন, গরমকাল, দরদরিয়ে ঘাম গড়ায় কপালে গলায়, ডুব দিয়ে এসে গা মুছলেই গন্ধটা যেন জানান দেয়। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় লাগে। গপ্প তো লকলক করছে প্রত্যেকের জিভে। মাঝরাতে মেয়েটা বলে, 'কিসের বাস মা? আতরের?'

ধমকাতে হয় অকারণে, 'হিঁদু ঘরের বেধবা, মাঝ রাত্তিরে আতর

মাখতে যাব কেন?' কিন্তু আতর জানে কথাটা মিথ্যে নয়। একটা গন্ধ বের হয়। কোত্থেকে যে হয় তাই অজানা। ভাতার মরেছে ছ বছরের মেয়েকে রেখে। তার গলার কাঁটা আবার অন্ধের লাঠি। মেয়ে পাশে শোয় বলে রাত দুপুরে উটকো লোককে ঠেকানো যায়। পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট মোল্লা সাহেব অবিশ্যি আসতো। এসে বসে থাকতো দোর-গোড়ায় পিঁড়ি পেতে চুপটি করে। ঘুমন্ত মেয়েটাকে দেখত আর বলত, 'তোর এখন দুটো ঘর দরকার আতর। মেয়ে বড় হচ্ছে হাজার হোক।'

'একলা ঘরে শুয়ে কি করব? আমার ভূতের ভয় লাগে।'

'ভূত? আমি এলে ভূতের বাপের হিম্মত হবে ভয় দেখানোর!'

'আপনি তো বাদলা না হলে আসেন না।'

'এসেই বা কি হবে। এই তো দোরগোড়ায় বসে থাকা।'

মেয়ে ছিল বলেই তো গণ্ডী পার হওয়া সম্ভব হল না এ জীবনে প্রেসিডেন্ট সাহেবের। অবশ্য এখন মরদখাকী বলে নাম ছড়াবার পর কেউ আর সখের বাগান ভাবে না, চোরাবালি বলে এড়িয়ে যায়। নইলে ওই দারোগাবাবুকে এড়িয়ে থাকা যেত? সাত বাচ্চার আধবুড়ো বাপ ধর্মের ষাঁড়ের মত ধেয়ে এসেছিল প্রায়।

কিন্তু আল পড়ল না হয় বেনোজল ঠেকাতে, দেওয়াল উঠল চৌদিকে চোর ডাকাত ঠেকাতে, কিন্তু তার নিজের কি হল? এ দেওয়াল যে চৌদিক গ্রাস করে তাকেই নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে না। আটাশ বছর মানে পুরু হলদে সর পড়া দুধ। টানটান সেই সরের ছাতের তলায় গনগনে আঁচে তেতে ওঠা দুধ ছটফটিয়ে মরে। একটু ফাঁক পাওয়ার সুযোগ, অমনি ফিনিক দিয়ে উঠবে। আর সেই বয়সে যার চারপাশে বদনামের লোহার দেওয়াল উঠল কোন মনসার চ্যালা তাতে গর্ত খুঁড়বে?

পান খাওয়া লালচে ঠোঁটে চিলতে হাসি ঝুলল আতরের। মরদখাকী! মন্দ কি? কিন্তু মরদ কোথায়? চারপাশে তাকালে শুধু শেয়াল শকুন নয় নেড়ি। ওই প্রেসিডেন্ট কিংবা দারোগা মানেই তো ওই। রেলের বাবুটার গলায় নরম সুর থাকতো। লোকটা বুঝে ওঠার আগেই দুম করে মরে গেল।

তা আটাশ বছর বয়সেও সত্যিকারের পিরীত তো কারো সঙ্গে হল না। চোলানি করতে হয় গ্রামটার জন্যে। প্রথমে অবিশ্যি ছিল নিজের পেট বাঁচানোর তাগিদ, সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরো গ্রামের হাঁ বন্ধ করার কারণ। মেয়ে বড় হচ্ছে। আর কদিন। তারপর তোমার মনের মানুষ এলেও মনকে চিতায় তুলতে হবে।

এখন তার অকারণে বদনাম ছড়াচ্ছে। ছড়াক যত ছড়াবে তত রাতে আঁচল আলগা করে ঘুমনো যাবে। কদিন থেকে আবগারীর নতুন বাবু তার দিকে তাকায় আবার তাকায় না। এরকম ক্ষেত্রে নিজেই আগ বাড়িয়ে কথা বলে আগুনে জল ঢেলে রাখে আতর। কিন্তু ওই মানুষটাকে দেখামাত্রই হাঁটু দুটোয় ঝিঁঝি ধরে, কানে রক্ত জমে। হারানকাকা খবর এনেছে বাবুটির নাম রতন। চাকরিতেও নতুন। স্টেশনে যাওয়ার পথে এর মধ্যে বার তিনেক মুখোমুখি হয়েছে সে। গতকাল গাঁয়ে ঢুকে যে আবগারীবাবুরা শাসিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে রতনবাবুও ছিল। যতবার চোখাচোখি ততবার বুকের মধ্যে পাক খেয়েছে বাতাস। কিন্তু তাতে কার কি ? পৃথিবীর কোন ভগবান তাকে নেবে, তার সেরকম ইচ্ছেকে নেবে এবং সেইসঙ্গে ইন্দুকেও ? এইটেই তো জ্বালা। চাওয়ার মুখ যার বড় তার পাওয়ার কপাল তো এই এট্টুসখানি।

মায়ের সঙ্গে মেয়েও তৈরী। ঘরে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। একা একা থাকতেও চায় না মেয়ে। বাপের স্বভাব। বাপ ভয় পেত ভূত আর পুলিসকে। বাপই নাম রেখেছিল মেয়ের। দেশের মাথা এসেছিলেন ডায়মণ্ডহারবারে। তাঁর নামেই নাম। যে মেয়েছেলেকে সারা দেশ ভক্তি আর ঈর্ষা করে তাকে তো কেউ বদনাম দিতে সাহস করে না। সেই মেয়েছেলের স্বামী মরেছে অকালে তবু তো কেউ তাকে বলে না ভাতারখাকী ? ইন্দুকে হতে হবে ওই রকম। হেসে ফেলল আতর। কে কাকে খায় ? ওসব খাওয়ার জিনিস হল ? মরণ !

ইন্দু হাঁটছিল তার মায়ের আঁচল ধরে। এই এক বদ অভ্যেস। হাত ছাড়িয়ে আতর ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'নিজের পায়ে চল। মাথা উঁচু করে হাঁট। এই এরকম। চলতে ফিরতে শুধু আঁচল ধরা। হাতটা সরিয়ে দিল

ঝটকায়।

মেয়ে ফ্যালফেলিয়ে তাকাল এবার মায়ের দিকে। কিন্তু তারপরই সে মায়ের চলা নকল করার চেষ্টা করল। কিন্তু পা ফেললেই মায়ের শরীরে যে নাচন লাগে তা তো তার শরীরে হয় না। হাড়জিরজিরে শরীরের তিন জায়গায় ফেঁসে যাওয়া ফ্রকটা টেনেটুনে নেয় ইন্দু। সকালে পান্তা খাওয়ায় পেট এখন ভারী। ইচ্ছে করেই সে মায়ের কাছ থেকে সরে সরে হাঁটতে শুরু করে। কাছে থাকলে যা বোঝা যায় না, সামান্য দূরত্ব তা স্পষ্ট করে। যেমন এই মুহূর্তে ইন্দুর মনে হল এই গাঁয়ে মায়ের মত দেখতে আর কেউ নেই!

দুপাশে দুটো মজাল পুকুর। মজাল হলেও হাঁটু মুড়লে ওপর থেকে দেখা যায় না। মাঝখানের চওড়া ঢালু জমিটায় রাবণের চিতা জ্বলছে। আহা কি দৃশ্য। দশ হাত দূরে দূরে দিয়ে শুরু হয়েছিল, প্রয়োজনের চাপে এখন উনুনগুলো ঘেঁষাঘেঁষি হয়েছে। দু-দশটা নয়, বিয়াল্লিশটা, অবশ্য রোজ সবকটাতে আগুন পড়ে না। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় চুল্লুর কারখানা এটা। জন্মইস্তক আতর ওই আগুন জ্বলতে দেখেছে। তখন মাল তৈরী হত খুব যত্ন নিয়ে। মাল ফুটিয়ে মাটির হাঁড়িতে মুখ বন্ধ করে হয় মাটির তলায় নয় পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হত ঠিক তিন হপ্তা। এতে বিষ মারতো, স্বোয়াদ বাড়তো। যত জমে তত মজে। তারপর আবার আগুনে তুলে এ হাঁড়ি থেকে ও হাঁড়িতে গরম রসের ধোঁয়া পাচার করা হত। সেই ধোঁয়া জমে জমে যেই রস হয়ে যেত তখন অমৃত তো কোন ছাড়। যত বেশী মজবে তত মাল দামী হবে। কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। অত সময় নষ্ট করার মত সময় নেই কারো। পেট খাঁ খাঁ করছে সবার। এখন ফোটাও ঢালো আর বেচে দাও। তবে হ্যাঁ, এই গাঁয়ের চুল্লু খেয়ে কেউ চোখ উল্টেছে এমন বদনাম দেওয়া যাবে না।

সাত সকালেই আজ পনেরটা উনুন জ্বলছে। কোমরে হাত দিয়ে গুনল আতর। এই উনুন জ্বলা দেখলেই তার যৌবনের কথা মনে পড়ে। ভাতারখাকী! উনুনের কাছে এলেই ভাতারের মুখ মনে পড়ে। রোগা ঢ্যাঙা মাথামোটা লোকটা। চুল্লুর হাতটাই যা ছিল ভাল। বেচত যত

খেত তার কম নয়। রাত্তিরে আতরকে প্রায়ই শবসাধনা করতে হত। পুলিস দেখলেই চিত্তির হত ওর প্রাণ। চুল্লু বিক্রী করে এক রাত্তিরে ফেরার পথে মাঠের মাঝখানে মরে পড়ে রইল। কে মারল, কি ভাবে মরল সে-রহস্য আজও অন্ধকারে। ভাতার মরলে কাঁদতে হয় বলে কেঁদে-ছিল আতর, কিন্তু কান্নাটা বুক থেকে আসেনি। যা সত্যি তা বলতে ভয় পায় না সে।

বাঁ দিকের বেলগাছটার গা ঘেঁষে যে উনুন সেটাই আতরের। হারাণ তাতে আগুন জ্বেলেছে সাত সকালে। মাল বেচলে দিনে দশ টাকা দিতে হবে এই কড়ার। আঠারো বছরের ছেলেটা খাটতে পারে খুব। তাকে দেখে বলল, 'আজ হাওয়া খারাপ।'

আতর চোখ ছোট করল, 'কেন?'

'হারু সেপাই এসে বলে গেছে উনুন না জ্বালতে আজ।'

'কেন?'

'তা জানি না।'

ওপাশ থেকে শিবুকাকা এগিয়ে এল, 'হারু ভাঙতে চাইল না কিন্তু মন কু গাইছে বড়। একবার থানায় গিয়ে খবর করলে বড় ভাল হত।'

উদাসী মুদ্রা আনল হাতে আতর, 'যান না, পেটের দায় তো সবার।'

'আমরা গেলে তো দোর থেকেই ভাগিয়ে দেবে। নইলে কি যেতাম না ভাবছ?'

অনুরোধ বললে কম হবে, প্রায় কাকুতি মিনতি শুরু হয়ে গেল চারপাশ থেকে। যে পূজার যা মন্ত্র। কানাই জ্যেঠা বলল, 'তুমি হলে গিয়ে মহাশক্তি, তুমি না গেলে অসুরদমন হবে কি করে? আজ বিকেলের মধ্যে মালগুলো পাচার করতে পারলে না হয় দুদিন বিশ্রাম নেওয়া যায়। কি বল সবাই?'

চিন্তিত মুখগুলো নড়েচড়ে দ্রুত সায় দিতে লাগল। এই রকম পরিস্থিতিতে আতরের নাকের পাটা বড় কাঁপে। হাঁটুর ওপরটা ভারী

হয়ে যায়। রাজেন্দ্রাণীর মত সে তাকাল চারপাশে। একটাও মানুষ নেই, যেন এই জীবসকলের দায়িত্ব একমাত্র তার। সে পুকুরের দিকে মুখ ফেরাল। তারপর সন্ধানী চোখে জরিপ করে বলল, 'জলের তলায় সাতটা আছে ?'

কানাই জ্যাঠা বলল, 'হ্যাঁ, আজ সকালেই রেখেছি।'

'দু ঘণ্টায় যা হবার হয়ে গেলে সব কটাকে জলের তলায় পাঠানো হোক।'

হারাণ মাথা নাড়ল, 'এতে বড় বদনাম হয়ে যাচ্ছে বাজারে। এর পরে লোক মাল নিতে চাইবে না। খদ্দের বলছে সরেস হচ্ছে না।'

সরেস ! যে দেশে মেয়েছেলে নেই সে দেশে হিজরেও মহারাণী। থুতু ফেলল আতর, 'মাল না পেলে তো হাওয়া চাটবে মিনসেগুলো। একদিন সরেস না পেলে চলবে। আগে হাওয়াটা বুঝে আসি। কে যাবে আমার সঙ্গে ?'

কেউ মুখ খুলছে না। খুলবে না জানতো আতর। দারোগাবাবুর সামনে গেলে সব দু'মাসের শিশু হয়ে যায়। এবং এইটেই চাইছিল সে। হেঁকে বলল, 'যেতে পারি। কিন্তু উনুন প্রতি একটা করে টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ। মনে থাকে যেন।'

পারিশ্রমিকটা বড়ই ন্যায্য। যেতে আসতে তো একটা টাকাই বাস ভাড়া লেগে যায়। আপত্তি না করতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। আতরের চোখে নির্দেশ ঘুরতেই হারাণ হাত পাততে লাগল উনুনে উনুনে ঘুরে। চারপাশে এখন ম ম করছে হাঁড়ির বাষ্পের গন্ধ। আঃ ! আতর তাকিয়ে দেখল তার তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে ইন্দু সেই গন্ধ নাকে টানছে। তার চোখ বড় হল, 'অ্যাই, খেলতে যা, এখানে কি ?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'কোথায় ?'

'যেখানে যাচ্ছ !'

'একি মেয়েরে বাবা ! যেখানে যাচ্ছি সেখানে এক তান্ত্রিক বসে আছে। বাচ্চা মেয়ে পেলেই ছাগল তৈরী করে মাঠে ছেড়ে দেয়।'

'আর বড় মেয়ে পেলে ?'

হোঁচট খায় আতর, 'সেটা পেলে কি করে তাই দেখতে যাচ্ছি।'

'যদি তোমাকেও ছাগল বানায় ?'

'কেটে মাংস খাবে। এমনিতেই তো নোলা ঝরছে। যা। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়ি যাবি না। আর খবর্দার, পুকুরে নামবি না।'

বারোটা টাকা পাওয়া গেল। বাকী সব ট্যাঁকখালির জমিদার। এখন এ নিয়ে কচলাকচলি করে কোন লাভ নেই। টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে রওনা হল আতর। সিকি মাইল কাঁচা রাস্তা পার হলে তবে বাসের দেখা মেলে। অন্তত তিনজনকে কৈফিয়ত দিতে হল এরই মধ্যে। কোথায় যাচ্ছে সাত সকালে তা না জেনে যেন মানুষগুলোর স্বস্তি হচ্ছে না। একটু নির্জনে পড়ামাত্র পেছনে সাইকেলের ঘণ্টা বাজল। সরে যেতে যেতে দেখল আরোহী দু'পায়ে ব্রেক কষেছে, 'যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?'

'এই একটু, কাজে।' আতর ঠিক বুঝতে পারছিল না তার দাঁড়ানো উচিত কিনা।

'কাজটা কোনদিকে ?'

'থানায়।'

'অ। তা এখনও অনেকটা হাঁটতে হবে বাস ধরতে হলে।'

'তাই তো হয়।'

'কথাটা হল কি, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক আলাপটালাপ নেই। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন আছে। অবশ্য ইচ্ছে হলে জবাব দেবে নইলে নয়।'

আতর লোকটার দিকে তাকাল। তিরিশের গায়েই বয়স। শহরে থাকে। সেখানে নাকি বই বাঁধাই-এর দোকান আছে। ইদানীং গাঁয়ে আসেই না। প্রেসিডেন্ট সাহেব বিছানায় পড়ার পর আসা যাওয়া বেড়েছে। বাপের সম্পত্তি হাতাবার সুযোগ কেউ ছাড়ে না। আতর মুখ ঘোরাল, 'পথে দাঁড়িয়ে তো আর জবাব দেওয়া যায় না। সময়ও নেই।'

'ঠিক কথা। সময় আমারও নেই। অবশ্য এক কাজ করতে পার। আমার ক্যারিয়ারে চেপে বস। পথটাও কমে যাবে, কথাটাও শেষ হবে।'

'আমি কারো বোঝা হতে চাই না।'

'বোঝা মনে করলেই বোঝা। উঠে এস, অসম্মান হবে না।'

'পাঁচজনে দেখলে কুগল্প রটবে।'

'গ্যাখো বাবা, কে কি বলল তাতে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কারো খাই না পরি ? অবশ্য নিজেরটা তুমি ভাবতে পারো।'

'গল্পে তো ডুবে আছি, আর কত গল্প লাগবে শরীরে।' রাস্তাটা কম নয়। আতর উঠে বসল ক্যারিয়ারে। প্যাডেল ঘুরিয়ে টাল সামলে প্রশ্ন করল, 'আমার নামটা জানো ?'

'জানি।'

'অবশ্য বিয়ের পর যখন তুমি গাঁয়ে এলে তখন থেকেই আমি কলকাতায়।'

'কি প্রশ্ন ছিল ?' সিটের পেছনে দুটো গোল রিঙে আঙুল শক্ত করে বসেছিল আতর। ভয় হচ্ছিল শাড়ি না জড়িয়ে যায় সাইকেলের চাকায়।

'বাপ কি তোমার কাছে যেত ?'

বুকের ভেতর ছ্যাঁকা লাগল আতরের। মোল্লা সাহেবের সুপক্ক মুখখানা মনে পড়ল।

'উত্তরটা চাই। অবশ্য দিতে ইচ্ছে করলে।'

'তিনি দেখা করতেন।' কথাটা বলামাত্র শরীরের সেই বিশেষ গন্ধটা নাকে লাগল আতরের।

'ঠিক কি রকম সম্পর্ক ছিল ?'

'উনি গল্প করতে ভালবাসতেন।' সামনে বসা লোকটা কি গন্ধটা টের পাচ্ছে ?

'কি গল্প ?' যেন স্পষ্ট নাক টানল লোকটা। মুখ ফিরিয়ে দু'পাশের গাছ দেখল।

'এই সেই।' কথাটা বলে যেন প্রাণপণে নিজের রোমকূপ ঢাকতে চেষ্টা করল আতর।

'আর কিছু ?'

'না।' এবার যেন গন্ধটা কমছে। নিঃশ্বাস সরল হয়ে এল আতরের।

'বাদলার রাত্রে কি তোমার ঘরে ঢুকেছিল ?'

'না।'

'অ। তা সবাই বলছে তোমার জন্যেই তার শরীর পড়েছে।'

'পিতৃতুল্য লোকের সম্পর্কে কুকথা বলতে নেই।'

'পিতৃতুল্য ?'

'নয়তো কি ? আমার বয়স আর তার বয়স ?'

কথা বলতে বলতে আতরের চোখ এড়াল না পথচারীদের দিকে। সবাই হাঁ হয়ে দেখছে।

'তুমি যাই বল, আমার বাপের মেয়েছেলে দোষ ছিল। যদি তোমাকে বিয়ে করত—।'

'আমি করতাম না।'

'কেন ? গ্রামের প্রেসিডেন্ট। চোলাই ছাড়াই ভাল চলে।'

'বুড়ো হাবড়াকে মন দেব এমন ছাতাধরা মন নাকি আমার ?'

'ও।' কিছুক্ষণ চুপচাপ চালানোর পর আবার প্রশ্ন, 'তাহলে যা শুনেছি তা সত্য নয় ?'

'শহরের মানুষেরা শুনেছিলাম বুদ্ধিমান হয়।'

'হুঁ। বাসের রাস্তা এসে গেছে। তা থানায় কেন ?'

'পেটের ধান্দায়।' বলে নেমে পড়ল আতর। তাকে নামতে দেখে লোকটাও। আতর চারপাশে তাকাল। বাসের জন্যে অনেকেই দাঁড়িয়ে। তাদের গাঁয়েরই কেউ কেউ। আর একটা গল্প জিভে জিভে জন্ম নিচ্ছে। নিক। সে হেসে বলল, 'আবার কেন, বললামই তো, মোল্লা সাহেব খুব ভাল মানুষ ছিলেন।'

'ছিলেন ? বাপ কিন্তু এখনও মরেনি। শোনা কথা যাচাই করে নিচ্ছিলাম। তুমি কিছু মনে করো না। পেটের ধান্দায় থানায় কেন ?'

তোমার বাপেরও কিছু ছিল না, তোমারও না। বলতে গিয়ে থমকে গেল আতর। গাঁয়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন্ কর্তব্যটা করেছে লোকটা ? এতগুলো উনুন জ্বলে কিন্তু দারোগাবাবুর সঙ্গে তো লড়াই করতে যায়নি। তার ছেলের মুখের প্রশ্নের জবাব দেবে কেন সে ?

তবে লোকটার বোধবুদ্ধি আছে। জবাব না পেয়ে হাসল। বলল, 'তোমার হিম্মত আছে। খুব ভাল। তিনটে নাগাদ ফিরব। যদি আসো তো ক্যারিয়ারে চাপতে পারো।' বাস দেখা যাচ্ছিল। আতর উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

ইন্দুদের দলে নজন। প্রায় সমবয়সী সবাই। আর একটু বাড়লেই তো ওপাশের উনুনের কাজে লেগে যেতে হয়। পুকুরের উল্টো দিকে ওই নজন উনুন সাজাচ্ছিল। খেলার উনুন। তিন পাথরের খাঁজে কল্পিত আগুন গুঁজে এই খেলা শুরু হয়। ঠিক যেমন যেমন বড়রা করে তেমন করেই খেলা ওদের। খেলতে খেলতে ব্যাপারটা প্রায় নিখুঁত হয়ে এসেছে। পাঁচ থেকে নয়ের মেয়েগুলোর লিকলিকে শরীর, ছেঁড়া জামা আর উদোম গায়ের ইজের পরা ছেলের দল সেই খেলায় অংশ নেয়। নকল উনুনে কল্পিত আগুন জ্বলে, পাতার হাঁড়িতে স্বপ্নের রস ফোটে। সেই পাতা পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হয় যত্ন করে। নিয়মের কোথাও ভুল নেই। অনেক দূরের সত্যিকারের উনুনগুলোর দিকে পেছন ফিরে এরা নাক টানে, 'আঃ, কি বাস না রে!' তারপর দিনের শেষে যে যার হাঁড়ি নিয়ে শহরে চুল্লু বিক্রি করতে যাওয়ার নাম করে যখন ঘরে ফেরে তখনই খেলা শেষ। কিছুদিন হল এই খেলার কর্ণধার হল ইন্দু। বাকীরা বোধহয় দেখেছে ওর মায়ের প্রতাপ কিভাবে তাদের বাপ-কাকারা মেনে নিচ্ছে। হয়তো সেইটেই কাজ করছে ইন্দুর নেতৃত্ব মানতে।

নজনের দলটা জড়ো হতেই ইন্দু গালে হাত রাখল, 'সব্বোনাশ হয়েছে।'

কচি মুখগুলো অবাক হল, 'কি হয়েছে রে?'

'মা গেছে থানায়। হারু সেপাই বলে গেছে উনুন না জ্বালতে।' ইন্দু জানাল।

'জ্বাললে কি হবে?' সবচেয়ে যে কচি তার প্রশ্ন।

'জ্বাললে কি হয় জানো না? মাঝে মাঝে ওদিকে যখন পুলিস হামলা করে তখন কি হয় দ্যাখো না?' ইন্দু ঝাঁঝিয়ে উঠল।

বড়সড় একজন বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়ল, 'ও ছাখেনি। শেষ বার হয়েছিল এক বছর আগে। ও তখন আসত না।'

ইন্দু বলল, 'এলে হাঁড়ি ভাঙে। সব রস পুকুরে ঢেলে দেয়, মেয়ে-ছেলের ওপর অত্যাচার করে। যাকে পায় তাকেই কোমরে দড়ি বেঁধে মারতে মারতে নিয়ে যায়।'

'তাহলে কি হবে?' আর একজনের উদ্বেগ।

'মা গেছে থানায়। আমার মা তো কখনও হারে না।'

কিছুক্ষণ গজর গজর হবার পর নতুন খেলাটা জন্ম নিল। নজনের মধ্যে চারজন হয়ে গেল থানার দারোগাবাবু, হারু সেপাই এবং দুই বন্দুকধারী। বাকী পাঁচজন যখন উনুন জ্বালবে রস ফোটাবে তখন পুলিসরা ছুটে আসবে রে রে করে। উনুন ভাঙবে, হাঁড়ি ফাটাবে, রস ফেলবে জলে। শোনামাত্র উত্তেজনা বাড়ল শীর্ণ শরীরগুলোতে। বৈচিত্র্যে কার না আনন্দ হয়! চারজন চলে গেল পুকুরের ওপাশে ঝোপের আড়ালে। পাঁচজনে যখন রস ফোটাতে ফোটাতে আড়চোখে সেদিকে তাকাচ্ছে তখনই হইহই করে ছুটে এল তারা। গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে সেগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে মুখে চিৎকার ছোটাল। খুশীমুখে এই পাঁচজন অমনি সরে দাঁড়াল। যাত্রা দেখার মত ওরা ভাঙচুর হওয়া দেখল। ইন্দু চেঁচিয়ে উঠল, 'এই দারোগা, তুই হাসছিস কেন?'

ঢ্যাঙা ছেলেটা মাথা নাড়ল, 'দারোগা হাসে না? সেবার দারোগাবাবু এসেছিল তোদের বাড়িতে, আমি হাসতে দেখেছি।'

কথাটা শোনামাত্র মনে পড়ল দৃশ্যটা। মাকে জেরা করতে করতে দারোগাবাবু খুব হেসেছিল। চেয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল খেয়েছিল। কিন্তু তবু ঠিকঠাক হচ্ছে না। খেলাটা কিছুতেই জমছে না।

আতরকে দেখে দারোগাবাবুর মুখে কোন ভাবান্তর হল না। ঘরে দুটো সেপাই আর একটা গুঁফো লোক দাঁড়িয়েছিল। আতর যে ঘরে ঢুকেছে তা তিন জোড়া চোখের ঘুরুনিতে বোঝা গেলেও দারোগাবাবুর

কোন বিকার হল না। শেষ পর্যন্ত বাজখাঁই গলায় বিরক্তি ঝরল, 'কি চাই ? এরা সব হুটহাট করে ঘরে ঢোকে কি করে ? অ্যাই সেপাই, সেপাই !'

থানায় ঢোকার আগে তিরিশ পয়সার পানে ঠোঁট লাল করেছিল আতর। দারোগার কথায় সেই লালে মোচড় লাগল। বাঁ হাত কোমরে রেখে চোখ ছোট করল সে, 'কথা ছিল !'

'কি কথা ?'

'পাঁচজনের সামনে বলতে বললে বলতে পারি।'

দারোগা চট করে গুঁফো লোকটাকে দেখে নিল, 'আপনারা একটু বাইরে যান তো ভাই। ইনফর্মার ! বুঝতেই পারছেন। যাও, এঁকে নিয়ে পাঁচ মিনিট পরে এস।' শেষের নির্দেশ সেপাই দুটোকে। ঘর ফাঁকা হলে দারোগার গলায় বিরক্তি ঝরল, 'কি মতলব ?'

চেয়ারে বসার খুব লোভ হচ্ছিল আতরের। কিন্তু পায়ে কোথায় যে আটকায়, সে হাসল, 'আমরা তো সব ঠিকঠাক দিচ্ছি তবে আবার এ ঝামেলা কেন ?'

'কিসের ঝামেলা ?'

'আজ আবার হামলা হবে বলে শুনলাম।'

'কে বলেছে ?' দারোগার চোখ ছোট হয়ে এল। মাথা নাড়ল আতর, 'খবর তো হাওয়ায় ভাসে। জামাই আদরে আপনাকে পুষছে গাঁয়ের লোক, তারপরেও ?' হারু সেপাই-এর নাম বলে ভবিষ্যতে খবর পাওয়ার পথটা বন্ধ করার মত বোকা সে নয়।

'পুষছে ? কি কথার ছিরি ! ভদ্রভাবে কথা বলতে পারো না ?'

'ছোটলোকের মুখে বড়লোকের কথা কি করে আসবে ?'

'বড্ড বাজে বকো। প্রেসিডেন্টকে কি করেছিলে ?'

'আমরা কি কিছু করি ? তেনারা নিজেরাই নিজেদের করে থাকেন।'

'বড্ড ঝোলাচ্ছ আমাকে। শালা রেলের ক্লার্কের সঙ্গে মজাকি করতে পার আর আমার জন্যে দরজা খুলতে তোমার বুকে বাত ধরে যায়। লোকে বলছে তোমার ছায়ায় গেলে নাকি দুর্ঘটনা ঘটবে। তাই নাকি ?'

'তাহলে আর আসবেন কেন ? তবে কারো দুর্ঘটনা ঘটার আগে আমার শরীরে চাঁপার গন্ধ বের হয় এমনি এমনি। দেখুন, দেখুন।' টেবিল ঘুরে কনুইটা সে নিয়ে গেল দারোগার নাকের সামনে। পুলকিত দারোগা নাক টেনে বলল, 'আঃ, কি মেখেছ ? আতর ?'

'না। রক্তের গন্ধ। আজ হামলাটা বন্ধ করুন।'

তখনও বোধহয় গন্ধটা শরীরে, দারোগা ঘন ঘন মাথা নাড়ল, 'দূর, কে তোমাদের গুল মেরেছে। পুলিশ নিয়ে গাঁয়ে ঢোকার কোন প্ল্যানই নেই। আজ রাত্রে আমি যাব একা একা। মেয়েটাকে সরিয়ে রেখ। কি মেখেছ গো ?'

মদ খাওয়া ঢোল মুখের দিকে তাকিয়ে আতর বুঝতে পারছিল না লোকটা সত্যি বলছে কিনা। হারু সেপাই কি তামাসা করতে অদ্দূর হেঁটে গেল ? সে যে সন্দেহ করছে তা দারোগার নজরে পড়ল, 'রাতের উত্তরটা পেলাম না।'

হাসল আতর, 'বেশ তো। আপনার বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমার মেয়ের সঙ্গে তখন খেলা করবে।'

'অ্যাঁ ?' চোখ বড় হয়ে গেল দারোগার, 'গেট আউট। গেট আউট। আমার ফ্যামিলি নিয়ে ইয়ার্কি।'

আতর বাইরে বেরিয়ে এল। গুঁফো লোকটা তার দিকে তাকাচ্ছে। সে থানার বাইরে এসেই দেখল পাশের চায়ের দোকান থেকে সুড়ুৎ করে চলে এল হারু সেপাই, 'কি বলল শালা ? ঠাণ্ডা করতে পারলে ? করে লাভ নেই। কাল ওর বাবারা এসেছিল। টাকা দাও বলে খবরটা দিয়েছে। নাম বলোনি তো ?'

'না। বাবারা মানে ?'

'ওপরতলার অফিসার। দারোগার কিছু করার নেই। গাঁয়ে গিয়ে উনুন নেভাও।'

বাস ধরার আগেই কেবলরামের সঙ্গে দেখা হল। এ তল্লাটের সব-চেয়ে বড় চুল্লুর সাপ্লায়ের ডান হাত। কেবলরাম অনুযোগ করল আতরের গাঁয়ের মাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানিক বলছে এইরকম চললে

বাজার নষ্ট হবে। কিছুক্ষণ বকর বকর করতে হল লোকটার সঙ্গে। কেবলরাম আরও খবর দিল কয়েকটা চুল্লুর আড়তে নাকি এ সপ্তাহে রেইড হবে। ব্যাপারটা সামলানো যাচ্ছে না।

অতএব কিছু করার নেই। দু ঘণ্টা দাঁড়াবার পর বাসে উঠে আতর ঠিক করল গাঁয়ে গিয়ে জানান দেবে যার যা হয়েছে, এবার উনুন নেভাও। দিন দুয়েক হাত পা গুটিয়ে বসা যাক। বাস থেকে নামতেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। সে দাঁড়িয়ে আছে সাইকেলে ঠেস দিয়ে। ওকে দেখামাত্র এগিয়ে এল, 'এক ঘণ্টা আগেই চলে এসেছ। আমার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না নাকি?'

'না না। আমার খুব তাড়া আছে।'

'ও। চল, তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

আতর ভাবল ভালই হল। পায়ে হেঁটে যতটা, তার সিকি সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে সাইকেলে। কিন্তু ওকি! ক্যারিয়ারে মালের বস্তা যে! দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে বলল, 'ওসব কিনতে হল বাপের সেবার জন্যে। তুমি এই রডে উঠে বস।'

আতর চারপাশে তাকাল। বাস স্টপের দশ গণ্ডা মানুষ ওদের দিকে তাকিয়ে। সব কটা চোখ এখন ছোবল মারছে। সাহস আছে মানুষটার। সাহসী লোকদের চিরকালই পছন্দ আতরের। অতএব সে রডে চেপে বসল। দু পাশে দেওয়ালের মত দুটো সবল হাত হ্যাণ্ডেল চেপে ধরেছে। সিঁটিয়ে বসতে চেয়েছিল আতর, ধমক খেল, 'ও ভাবে বসলে পড়ে যাব।'

পাঁই পাঁই করে সাইকেল ছুটল। জনসাধারণ কথা বলার সুযোগটি পর্যন্ত পেল না ওই মুহূর্তে। প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে নাক টানল সে, 'আঃ, নামকরণ সার্থক। কি মেখেছ?'

'কিছু মাখিনি।' এখন শরীরে শরীরের স্পর্শ হঠাৎ গায়ে কাঁটা ফোটে কেন?

'যাঃ! মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।'

'ওটা এমনি এমনি বের হয় শরীর থেকে।'

'যাঃ!'

'মন ভাল হলে বের হয়।' এবার হাসল আতর।

ব্রেক কষল সে। হ্যাণ্ডেলের ওপর আচমকা ঝুঁকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলাল আতর, 'কি হল?'

চোখ ফেরাতেই প্রশ্ন শুনল, 'এখন তোমার মন ভাল?'

কি বলবে আতর। মুখ নামাল। আর সেই সময় গোঁ গোঁ করতে করতে তিনটে জিপ ধুলো উড়িয়ে খোয়া পথ অন্ধকার করে ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে। পুলিস।

ছটফটিয়ে উঠল আতর, 'তাড়াতাড়ি চালান। সর্বনাশ হয়ে গেল।'

'কিসের সর্বনাশ?'

'পুলিসের জিপ গেল। হাঁড়ি ভাঙবে, কোমরে দড়ি পরাবে।' চোখে অন্ধকার দেখল আতর।

'অ। কিন্তু তুমি গিয়ে কি করবে? পুলিস চলে যাক তারপর গাঁয়ে ফিরো।'

'না, না। আমি ছাড়া কেউ ওদের সামলাতে পারবে না।'

'একটা কথা বলি। এসব নোংরা কাজ ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দেব?' হাঁ হয়ে গেল আতর।

মাথা নাড়ল সে, 'আমার ওপর ভরসা করতে পারবে?'

এই নির্জনে সাইকেলের রডে বসে কেঁপে উঠল আতর। দূরের ধুলোর ঝড়টা এখন মাঠের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। সে বলল, 'পরের কথা পরে, আগে আমি গাঁয়ে ফিরব।'

প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে সে নাক টানল, 'যাচ্চলে। গন্ধটা নেই। কি করে হল?' জবাব দিল না আতর। নিজেকে তখন শাপমুন্যি করছে সে। কেন দেরি করল অকারণ। কেবলরামের সঙ্গে কথা শেষ করে দু'দুটো ভীড় বাস কেন ছেড়ে দিল। কেন সময়টাকে তিনটের কাছাকাছি আনতে চাইছিল? এইসময় সে খেয়ালই করছিল না দুটো হাত হ্যাণ্ডেল ধরে রেখেও ব্যবধান কমিয়েছে। তার শরীরের অনেকটাই চালকের স্পর্শের মধ্যে। তার চোখ শুধু গাঁয়ের পরিচিত দৃশ্যগুলো খুঁজছিল। এবং তখনই চিৎকার চেঁচামেচি কানে এল যখন সাইকেল ব্রেক কষল।

সে লাফিয়ে নামতে গিয়ে দেখল পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে। নিজেকে সামলাবার সময় চালক বলল, 'আমি কাল অবধি গাঁয়ে আছি। ভেবে ছাখো।'

নয়জোড়া চোখ ঝোপের আড়ালে রোগা শরীর লুকিয়ে দৃশ্যটা দেখল। তিনটে জিপ থেকে পনেরটি পুলিস নামল 'রে রে' শব্দ করে লাঠি উঁচিয়ে। কয়েকজন বন্দুক তুলল। ফটাফট হাঁড়ি ভাঙছে। চিৎকার চেঁচামেচি সমানে চলছে। কেউ কেউ মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছিল পালাবার জন্যে। তাদের টেনে হিঁচড়ে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। সিঁটিয়ে ছিল নয়টি শীর্ণ শরীর। বেধড়ক মার চলছে একতরফা। কয়েকজন পুলিস যখন নেমে এল পুকুরধারে তখনই ছুটে এল আতরবালা। চিৎকার করে দু হাত তুলে এলোচুলে আঁচল মাটিতে লুটিয়ে সে যখন দারোগার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন আটজোড়া চোখ বন্ধ হয়ে গেল ভয়ে।

দুই পুকুরের মাঝখানের মাঠ এখন শ্মশান। ভাঙা হাঁড়ি, আধানেভা উনুনের ধোঁয়া আর রসের গন্ধ ছাড়া সেখানে একটি প্রাণের অস্তিত্ব নেই। গাঁয়ের সমস্ত মানুষ বসে আছে রাস্তার পাশে আহতদের ঘিরে। এবারে পুলিস কারো কোমরে দড়ি পরায়নি। হাতের সুখ করার পর বলে গেছে আবার যদি উনুন জ্বলে তাহলে বাকীটুকু করবে। কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তাদের ছিলও না। যাদের মাথা ফেটেছে, হাত ভেঙেছে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টেম্পো ডাকতে লোক ছুটেছে বাস স্টপে। পুলিস চলে যাওয়ার পর ভীড় বেড়েই চলেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল আতর। তার শরীর ছেঁড়া শাড়িতে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মাঝে মাঝে কাঁপছে শরীরটা। কিন্তু নিতম্বের স্ফীতি, পায়ের খোলা গোছের ওপর নজর পড়ছে দর্শকদের। এইসময় সাইকেল চালক এসে দাঁড়াল তার পাশে। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি লাভ হল? বারণ করেছিলাম শুনলে না।'

মাটিতে মুখ গুঁজে আতর শরীরের যন্ত্রণা ঢাকতে ঢাকতে তখন অন্য একটা গন্ধ আবিষ্কারে বিভোর ছিল। পৃথিবীর শরীরেও এমন গন্ধ বের

হয় তার জানা ছিল না। প্রশ্ন শোনার পর সে দুলে উঠল। এবং তারপর হঠাৎ সে সশব্দে কেঁদে উঠল উপুড় হয়েই। লোকটার হাত তার পিঠে পড়ার পর কান্নাটাকে সে থামাতে পারছিল না।

যত মানুষ মার খেয়েছিল তত মানুষই হাসপাতালে গেল না। টেম্পো আসার আগেই বেশীর ভাগ উঠে গেল নিজের ঘরে। শরীরের যন্ত্রণার চাইতে হাঁড়ি ভাঙার বেদনা এখন বড় হয়ে উঠেছে। এ কেমন বিচার! প্রতি মাসে টাকা নিচ্ছ অথচ মারার সময় সেটা খেয়াল থাকছে না? কেউ কেউ বলল, এ দারোগার কর্ম নয়। সে এসেছিল ওপর-ওয়ালার চাপে বাধ্য হয়ে। তবে আতর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন সুযোগটা হাতছাড়া করেনি এই যা। তখন অবশ্য দৃশ্যটা দেখার মত সময় ছিল না কারো। প্রত্যেকেই জান বাঁচাতে ছুটছিল। তবে নজরে যে একেবারেই আসেনি তা নয়। আতরের শাড়ি ছিঁড়েছে, জামা টুকরো করেছে দারোগা। এখন কেউ বুঝতে পারছে না সে থানায় গিয়ে দারোগাকে কি বোঝাল? এতগুলো মানুষের পেটে ভাত যায় যে কাজের জন্যে সেটাই যদি বন্ধ হয়—! শোনামাত্র কেউ কেউ ধমকাল, বন্ধ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? কালবোশাখী হয় বলে কি কেউ রাস্তায় বের হয় না!

গুলতানির ফাঁকেই আহতরা সরে পড়ছিল। যাদের উপায় নেই নড়নচড়নের তারাই পড়ে মাটিতে। আতরের পাশে মোল্লা সাহেবের ছেলে তখনো বসে। মানুষজনের জিভে রস জমছিল। একজন জানতে চাইলো, 'খুব চোট লেগেছে মনে হয় আতরের। অ আতর!'

মোল্লা সাহেবের ছেলে বলল, 'চোট না পেলে কোন মেয়েছেলে এভাবে শুয়ে থাকে?'

'তা বাবা মেয়েছেলের শোওয়ার কি কোন ভাব আছে? আমি তো আজও ঠাওর করতে পারলাম না। তা তুমি যাবে নাকি ওর সঙ্গে হাসপাতালে?'

'আপনারা যখন যাবেন না তখন আমাকেই যেতে হবে। আপনাদের বাঁচাতে বোকা মেয়েটা—'

মোল্লা সাহেবের ছেলে কথা শেষ না করে টেম্পো দেখে উঠে দাঁড়াতে সবাই নিজেদের চোখ চেয়ে চেয়ে দেখল। শুয়ে থাকা মানুষদের তুলে নিয়ে যখন টেম্পো চলে গেল তখন ইন্দু পেছন পেছন ছুটছে।

ইন্দুর কান বাঁচিয়ে গুলতানিটা হচ্ছে না। সবই শুনতে পাচ্ছে সে। মোল্লা সাহেবের ছেলে আতরের পিঠে হাত রেখেছে, টেম্পোতে উঠেছে সর্বসমক্ষে। কেউ বলল, ওদের নাকি এক সাইকেলে আসতে দেখা গেছে। দারোগা তো হাতের সুখ মিটিয়ে নিয়েছে। আর সেটা জানার পরেও এত কাণ্ড ? সন্ন্যাস রোগে বাপ পড়েছে, ছেলের এবার কি হয় তাই ছ্যাখো। কুলকুচি করা জল কেউ মুখে তোলে ? অবশ্য একথাও অনেকে স্বীকার করল, আতর যদি তখন ছুটে না যেত তাহলে পুলিস সবকটাকে সদরে চালান দিত।

মানুষজন যখন যে যার ঘরে ফিরে গেল তখনও ইন্দু মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার খুব রাগ হচ্ছিল মায়ের ওপর। যাওয়ার আগে মা তার সঙ্গে একটাও কথা বলে গেল না। কিন্তু মোল্লা সাহেবের ছেলের হাতটা চেপে ধরেছিল। কেন ? ওকে তো মা চেনেই না। যদিও লোকটা টেম্পোতে উঠে চিৎকার করে তাকে বলেছিল, 'খুকী, ভয় পেয়ো না, তোমার মা ওষুধ নিয়ে আজ রাত্রেই ফিরে আসবে', তবু তার রাগটা শরীর জুড়ে ছিল।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইন্দু দেখল দূরে তার আট খেলার সঙ্গী বসে আছে দঙ্গল পাকিয়ে। আট জোড়া চোখ দমবন্ধ করে নাটক দেখছিল এতক্ষণ। ওদের কাউকে তো টেম্পো নিয়ে যায়নি হাসপাতালে। আজ রাত্রে যদি মা না ফেরে তাহলে সে কার কাছে থাকবে ? কি দরকার ছিল মায়ের ওভাবে ছুটে যাওয়ার ?

আটজনের একজন নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াল। এখন সব শান্ত। শুধু বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে রসের গন্ধে। পুকুরে লুকিয়ে রাখা হাঁড়িগুলো নিয়ে গেছে গ্রামের লোক পুলিস চলে যাওয়ার পর। উনুনের আগুন নিভিয়ে দেওয়ার পরও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হঠাৎ সেই শিশু তার ভাঙা ডালের লাঠি আকাশে উঁচিয়ে ছুটে গেল দুই পুকুরের মাঝখানে। তার

মুখে জিপের ইঞ্জিনের শব্দ। কাছাকাছি পৌঁছে সেটা সরু হুঙ্কারে পরিণত হল। এবং সেই সঙ্গে এলোপাথাড়ি আঘাত করল কয়েকটা ভাঙা হাঁড়িতে, যেমন পুলিসরা করেছিল।

দৃশ্যটা দেখামাত্র আর একজন উদ্বুদ্ধ হল। এবং তারপরেই দেখা গেল পুরো দলটা পুলিস হয়ে ভাঙা হাঁড়িকে আরও টুকরো করছে। কিন্তু এ খেলায় বেশী মজা নেই। আটজনের দলটা দুটো ভাগে আলাদা হল। চারজন চলে এল গাছের এপাশে লাঠি হাতে। তারা পুলিস। ঢ্যাঙা ছেলেটি নেতা। অন্য চারজন ধোঁয়া বের হওয়া উনুনে ভাঙা হাঁড়ি চাপাল। এই প্রথম সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে খেলাটা। হাঁড়িতে তখনও রস গড়ানো আছে। চোখে মুখে ধোঁয়া লাগায় খেলার চেহারাটা আরও আন্তরিক হল। এইসময় গাছের আড়াল থেকে জিপের ইঞ্জিনের আওয়াজ উঠল। তারপরই চারজন লাঠি আকাশে ঘুরিয়ে লাফিয়ে পড়ল 'মার শালা, ধর শালা' চিৎকারে। তাণ্ডবটা শুরু হওয়া মাত্র দেখা গেল মাঠ পেরিয়ে ইন্দু ছুটে আসছে। তার গলায় আকূতি মিনতি, 'ভেঙে দিও না, আমাদের পেটের ভাত মেরো না, দোহাই তোমাদের।'

ঢ্যাঙা ছেলেটা এই কথা শুনে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে অন্যরাও। ইন্দু চিৎকার করে উঠল, 'এই গাধা! পুলিস তখন অমন করে তাকিয়েছিল?'

লজ্জায় জিভ কাটল ঢ্যাঙা, বলল, 'আবার বল।'

ইন্দু আবার শব্দগুলো ছুঁড়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢ্যাঙার ওপরে। ওপাশে সঙ্গীরা হাঁড়ি ভাঙছে কিংবা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। ঢ্যাঙাকে ইন্দু বলল, 'আমার চুলের মুঠি ধর। গালাগাল দে।'

ঢ্যাঙা খপ করে ইন্দুর ঝুঁটি ধরতে গিয়ে একটা পাশ ধরে রাগী ভঙ্গীতে বলতে পারল, 'অ্যাই শালা!' তারপর দু'তিনবার ঝাঁকাল।

এতেই হাড়জিরজিরে শরীরটায় প্রবল যন্ত্রণার সৃষ্টি হল। তবু ইন্দু মায়ের ভঙ্গী তুলল সারা শরীরে। ছটফটিয়ে সে চিৎকার করছিল বাধা দেওয়ার জন্যে। ঢ্যাঙা ছেলেটি আবার দিশেহারা। ইন্দু সেই অবস্থায় চাপা স্বরে বলল, 'আমার বুকের কাছটা ছিঁড়ে দে না!' সচকিত ঢ্যাঙা

দারোগাকে নকল করল, করে থেমে গেল। ফুঁসে উঠে ইন্দু তার হাড়-সর্বস্ব পাঁজরে ঢ্যাঙার হাত নিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, 'খামচে ধর, দারোগাকে দেখিস নি? রক্ত বের করে দে।'

হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ঢ্যাঙা ছেলেটি ডুকরে কেঁদে উঠল। তার মাথা দুপাশে দুলছিল, 'না, আমি পারব না, আমি পারব না।'

প্রতিপালন

'কি আশ্চর্য! তোমার ওই মিডল ক্লাস মানসিকতা এখনও গেল না!' স্বপ্না নিজের নির্লোম পায়ে ক্রিম বোলাতে বোলাতে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

নবকুমার ভি সি আর বন্ধ করে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, সিম্পলি উই কান্ট অ্যাফোর্ড ইট রাইট নাউ। তাছাড়া অ্যাম্বাসাডারটা তো কোনও ট্রাবল দিচ্ছে না।'

'তোমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে তো জায়গা ছিল, তা হলে সানি পার্কে উঠে এলে কেন? তোমার কোন পূর্বপুরুষ কালার টি ভি, ভি সি আর, ফ্রিজ, কার্পেট ব্যবহার করেছেন? নবু, আজকের যুগে যে মিনিমাম নিড না মেটালে নয় তার বাইরে আমরা যাচ্ছি না।' স্বপ্না উঠে দাঁড়াল। তার ধবধবে সাদা নাইটির প্রান্ত হাঁটুর সামান্য নিচে সঙ্কুচিত হওয়ায় পায়ের গোছে হাঁসের ডিমের আদল আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে নবকুমার তারিফ করল। তার বউটি যাকে বলে সত্যিকারের সুন্দরী। অবশ্য তাদের পরিবারের মেয়েরা দেখতে খারাপ নয়। কিন্তু বাঙালী মেয়েরা এত শরীর ঢেকেঢুকে রাখতে ভালবাসে যে তাদের সৌন্দর্যটাই মাঠে মারা যায়।

স্বপ্নার শরীরে হাঁটলেই ছন্দ আসে। কে বলবে তেত্রিশে পড়ল ও। তেষট্টির আগে টসকাবার কোন চান্স ও নেবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে নবকুমার তড়িঘড়ি বলল, 'ডার্লিং, ইউ নো, প্রায় চার হাজার বেরিয়ে যাচ্ছে প্রতি মাসে ধার শোধ করতে। এই ফ্ল্যাটের টাকা শোধ করার পর মারুতি কিনলে হত না?'

'তুমি একটু ড্যাসি হও তো নবু। ওই বুড়ি অ্যাম্বাসাডার নিয়ে ক্লাবে যেতে আমি লজ্জায় মরে যাই। মিসেস মিত্তির ঠাট্টা করছিলেন সবার সামনে। এটাকে বিক্রি করলে আর হাজার পঞ্চাশেক লাগবে। ওয়েল, তুমি যদি না পারো—।'

'না না, তা বলছি না। কিন্তু—।'

'নবু, ধরো আমি যদি চাকরি না করতাম, ধরো আমার গোটা তিনেক বাচ্চা থাকতো, তা হলে তুমি কি করতে? ওই শ্যামবাজারের বারোয়ারী বাড়ির এক ঘরের অন্ধকূপে বাকি জীবন কাটাতে বলতে তো?' স্বপ্না এগিয়ে এল নবকুমারের কাছে। একটা আঙুল নবকুমারের চিবুকে রেখে বলল, 'আমরা একটু আরাম করে বাঁচতে চাই, চাই না? একটা থার্ড ইনকামের ধান্দা লাগাও না। তোমার কলিগ গুপ্তাকে দেখেও শিখলে না?'

"গুপ্তা তো লেফট অ্যাণ্ড রাইট ঘুস নেয়।'

'আঃ। এটাও একটা মিডল ক্লাস সেন্টিমেণ্ট। যাক, এখন তৈরি হয়ে নাও। আধ ঘণ্টার মধ্যে বের হব। তুমি কি এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছ? তা হলে বলে ফেল।' স্বপ্না চলে গেল ঘর ছেড়ে। সেই যাওয়া মন ভরে দেখল নবকুমার। তার আট বছরের বিবাহিতা স্ত্রী। অথচ প্রতিদিন নতুন দেখছে বলে মনে হয়।

এজেন্সিতে ফোন করল নবকুমার, 'মেডিক্যাল চেক আপ হয়েছে এ মাসে?'

মিস্টার সেন বললেন, 'কোন প্রব্লেম নেই স্যার। ডক্টর খাসনবীশ চার সপ্তাহ অন্তর দেখছেন। একটু আণ্ডার ওয়েট, এখনও তো সময় রয়েছে।'

নবকুমার বলল, 'বড্ড অভাবী পরিবার থেকে সিলেক্ট করেছেন আপনি। গতবার যখন গিয়েছিলাম তখন রোগা লিকলিকে বাচ্চাগুলোকে দেখে স্বপ্নার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শরীরের জন্যে একদিন অফিসে অ্যাবসেন্ট হওয়াও এখন অ্যাফোর্ড করা যাচ্ছে না।'

মিস্টার সেন দুঃখিত গলায় বললেন, 'খুব দুঃখিত স্যার। তবে এখনও তো সব শ্রেণীর মানুষ যথেষ্ট আধুনিক হয়নি, তবে বছর দশেকের মধ্যে আমরা আরও একটু সচ্ছল পরিবার পাব বলে আশা করছি।'

'মাই গড!' নবকুমার চমকে উঠল, 'তখন আমার কোন প্রয়োজন থাকবে না। আচ্ছা, ডাক্তার খাসনবীশের সঙ্গে আমাদের দেখা করার

কোন প্রয়োজন আছে?'

'না না, স্যার। ওসব আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আপনাদেরটা নিয়ে এটা আমাদের একশ আটত্রিশটা কেস। প্রতিটি সাকসেসফুল।'

'থ্যাঙ্ক্‌। থ্যাঙ্কু।' রিসিভার নামিয়ে দেখে রুমালে মুখ মুছতে গিয়ে চমকে উঠল নবকুমার। ওপাশের দরজা থেকে রেড জিন্স আর হলুদ সার্ট পরে বেরিয়ে এল স্বপ্না। দু লাফে দূরত্ব ঘুচিয়ে হাত বাড়াল নবকুমার, 'ওফ্‌! ভেনাস কোথায় লাগে!'

স্বপ্নার ভুরু বেঁকে গেল আরও, 'যত সেকেলে উপমা। নো, তুমি আমাকে এখন ছোঁবে না। ফ্রেসনেশটা মেজাজে রাখতে চাই।'

বুড়ি অ্যাম্বাসাডারটাকে গলির মুখে রেখে নবকুমার আবার বলল, 'ডার্লিং, তুমি এবার না হয় গাড়িতেই অপেক্ষা কর। আমি ওকে ডেকে আনছি বরং।'

ভারী ব্যাগটা নবকুমারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্বপ্না হাঁটতে লাগল কথার জবাব না দিয়ে। বাধ্য হয়ে সমতা রাখতে পা চালাতে হল। প্রায় বস্তি টাইপের এই গলির মানুষগুলো প্রতিবারের মত এবারও স্বপ্নাকে যেন গিলে খাচ্ছে। এই নিয়ে তিনবার হল এখানে। এই মানুষগুলো কি আন্দাজ করছে তা তারাই জানে। মিস্টার সেন যখন প্রথমবার এখানে নিয়ে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন, 'পাঁচ পাবলিককে নিয়ে কখনও চিন্তা করবেন না।'

চার-চারটে উদোম, আধা-উদোম শিশু বারান্দায় শুয়ে-বসে ছিল। ওদের দেখামাত্র চিৎকার করে প্রায় নাচতে লাগল, 'এসেছে, এসেছে, এসেছে।'

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল। স্বপ্নার নাকে ততক্ষণে রুমাল উঠে গেছে। বড় বাচ্চাটা ততক্ষণে নবকুমারের ব্যাগ আঁকড়ে ধরতে চাইছে, 'কি এনেছ গো, দাও না গো, বড্ড খিদে লেগেছে।'

নবকুমার ব্যাগটাকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোদের মা কোথায়? ডাক তাকে।'

সেই সময় ভেতরের দরজায় নারী এসে দাঁড়াল। ওদের দেখল। তারপর নিচু স্বরে ডাকল, 'আসুন।'

আশে-পাশের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াতে ওরা ভেতরে গেল। ঘুপচি ঘর। গত মাসে একটা টেবিলফ্যানের ব্যবস্থা এজেন্সিকে বলে করিয়ে দেওয়ায় তবু স্বস্তি। একটা ছোট বেঞ্চি সামনে এগিয়ে দিতে ওরা দুটিতে পাশাপাশি বসল। স্বপ্না লক্ষ্য করল নারীর কণ্ঠার হাড় বড্ড বেশি প্রকট, নবকুমারের চোখে পড়ল, নারীর মধ্যভাগ স্ফীততর।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করছ, না বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছ?'

নারী উত্তর দিল না। মাথা নিচু করল। স্বপ্না ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এরকম করলে তো চলবে না। তোমার জন্যে আমাদের রাতের ঘুম চলে যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন তোমার শরীরে রক্ত নেই। রক্ত হবার জন্যে এত সব কিনে দিচ্ছি, প্রতি মাসে পাঁচশো করে মাইনে দিচ্ছি। আর তোমার কি কোন কর্তব্য নেই?'

নারী বলল, 'মাঝে মাঝে খাই। আসলে ওরা সামনে থাকলে—।'

স্বপ্না ঠোঁট বেঁকাল। তারপর নবকুমারকে বলল, 'দেখেছ কি চেহারা হয়েছে। চোখের তলায় কালি, হাতগুলো সরু সরু। এজেন্সিকে বল না ওকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে। অন্তত এই কয় মাস।'

এই সময় একটা শুঁটকো লোক বিড়ি টানতে টানতে দরজায় এসে দাঁড়াতেই নারী তার ঘোমটা আরও বাড়িয়ে দিল। লোকটা হাতজোড় করল, 'ওহো, নমস্কার! কি ভাগ্যি! দিন আমাকে ওগুলো দিন।' নবকুমারের হাত থেকে ব্যাগটা সরিয়ে নিল সে।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এজেন্সি আপনাদের ঠিকমত টাকা দিচ্ছে তো?'

'তা দিচ্ছে। কিন্তু তাতে চলে না। রেট বড্ড কম। ওই যে আমার চার মেয়ে দেখছেন, ভাল করে খাবার দিতে পারি না ওদের মুখে। তবে আমি তো দেখছি, আমার চার মেয়ে হবার সময় ওর চেহারা এত খোলতাই হয়নি।'

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল কথাটা শুনে, স্বপ্না সেটা উপেক্ষা করে বলল, 'শোন পেট ভরে খাবে, রাত্রে দুপুরে ঘুমবে। এখন কিছুদিন ঘরের কাজকর্ম করতে পার। কিন্তু পরের মাসে মেডিক্যাল চেক আপে যেন ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাই। এই ব্যাগে কমপ্ল্যান, আপেল, আঙুর আছে। কাউকে না দিয়ে নিজে খাবে। বুঝলে?'

নারী ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতেই ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। স্বপ্না নিচু গলায় নবকুমারকে কিছু বলতেই সে নারীর স্বামীকে একপাশে ডাকল, 'দেখুন মশাই, কিছু হলে তো আমরা এজেন্সিকে ধরব। কিন্তু পঞ্চাশটা টাকা আলাদা রাখুন। আপনি একটু যত্নটত্ন করবেন। ওজন আর রক্ত বাড়াতেই হবে ওর।'

শুঁটকো লোকটি হাত কচলালো, 'আপনারা অনর্থক চিন্তা করছেন। ফোর টাইমস এক্সপেরিয়েন্সড। কোন অসুবিধে হবে না দেখবেন।'

নবকুমার বলল, 'আর একটা কথা, উনি নার্সিংহোম থেকে না ফেরা পর্যন্ত ওঁকে আপনি কোনভাবে বিরক্ত করবেন না। বুঝতে পারছেন?'

'আমি বিরক্ত তো করি না। হ্যাঁ গো—।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। চেঁচাচ্ছেন কেন? বিরক্ত মানে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা বলছি।'

'অ। কিন্তু সে সব তো চুক্তির মধ্যে ছিল না।' লোকটি মাথা নাড়তে লাগল।

'ছিল না?'

'না। সেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

'কিন্তু আমার স্ত্রীর ইচ্ছা—।'

'পূর্ণ করব। আরও পঞ্চাশ বেশি পড়বে মাসে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

গাড়িতে ওঠার পর নাক থেকে রুমাল সরাল স্বপ্না, 'এই এজেন্সিটা খুব বাজে। তোমার পছন্দের ওপর ভরসা করেই অন্যায় হয়েছিল আমার।'

নবকুমার গাড়ি চালাতে চালাতে ঢোঁক গিলল, 'কিন্তু, ওদের তো

খুব নাম।'

'ছাই নাম। হাভাতে হাড়জিরজিরে আধবুড়িটাকে যোগাড় করেছে। গত মাসে যা দেখেছি তার চেয়েও শরীর ভেঙেছে। এইভাবে চললে নার্সিংহোমে যাওয়ার আগেই—। তখন আমি কি করব? কাকে নিয়ে থাকব?' প্রায় ডুকরে উঠল স্বপ্না।

বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে স্বপ্নার কাঁধে রাখল গাড়ির স্পিড কমিয়ে নবকুমার, 'ওঃ, নার্ভাস হয়ো না ডার্লিং। শুনেছি আমার ঠাকুমার ঠাকুমা হাড়জিরজিরে অবস্থায় দশবার সক্ষম হয়েছিলেন।'

এক ঝটকায় সরে গেল স্বপ্না, 'ওই পেডিগ্রি বলেই তো তোমার এই অবস্থা।'

মারুতি এসে গেল। সানি পার্কের গ্যারাজ থেকে বুড়ি অ্যাম্বাসাডার-টাকে চল্লিশ হাজারে বিদায় করার পরেও মাসে আরও দেড় করে আয় কমে গেল নবকুমারের। এখন সকালে চা এবং ব্রেকফাস্ট ছাড়া কিচেনের কোন ব্যবহার হয় না। দুপুরে লাঞ্চ যে যার অফিসে, রাত্রে ক্লাবে সই করে ডিনার। সামনে অবশ্য নার্সিংহোমের বিরাট খরচ আসছে। স্বপ্নার বাসনা নার্সিংহোমটা যেন খানদানি হয়। ডাক্তারের সঙ্গে সে ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এজেন্সিকে যে টাকা দিতে হচ্ছে নার্সিংহোম তার চেয়ে কম নিচ্ছে না। পরের মাসে স্বপ্না যায়নি। একাই ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছিল নবকুমার। নারীকে এবার একটু স্বাস্থ্যবতী মনে হয়েছিল তার। নিতম্ব এবং বুকের ভার যেন বেড়েছে। কথাটা শোনার পর স্বপ্না বলেছে, 'তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। মিস্টার সেন যা করার করবেন।' যেহেতু স্বপ্না এখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না, তাই ও নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করেনি নবকুমার।

আজ রাত্রে সমস্ত হৃদয় জুড়ে কল্লোল। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না সে। নতুন ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিল নবকুমার। আগামীকাল সকালে অপারেশন। ডাক্তার কোন রিস্ক নিতে চাইছেন না। নারীকে পরিচ্ছন্ন করে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে গত-

কাল। কিন্তু প্রসব বেদনার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। স্বপ্নাও চেয়েছিল সিজার হোক। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শিশু যে কষ্ট পায় তা ওই নারীর কারণে হোক সে চাইছে না। কিন্তু নারীর শরীরে রক্তাল্পতা, রক্তচাপ প্রতিকূল বলে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ডাক্তার। এজেন্সির মিস্টার সেন অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন স্বাভাবিক প্রসবের সময় প্রস্তুতির ক্ষতি হলে কোন দায়িত্ব নেই কিন্তু সিজারের কারণে যদি কিছু হয় তা হলে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করতে হবে। স্বপ্না বলেছিল, 'নিজে হলে তো আমি সিজার চাইতাম। ওর বেলাতেও তাই হোক।' অতএব ডাক্তার ঝুঁকি নিচ্ছেন।

নবকুমার মাটির অনেক ওপরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ তারায় তারায় জমজমাট। কে যেন বলেছিল পূর্বপুরুষেরা উত্তরাধিকারীর জন্মের আগে তারার মত চেয়ে থাকেন। নবকুমার আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসল, আগামীকাল আমরা বাবা-মা হচ্ছি। আর সেই সময় ভেতর থেকে স্বপ্নার গলা ভেসে এল, 'নবু!'

স্বপ্নার হাতে টেলিফোন। তার পরনে দুধরঙা স্বচ্ছ নাইটি। শরীরে সামান্য মেদের জায়গা হয়নি। খাপ খোলা তলোয়ারের মত ঝকঝকে, আকর্ষণীয়া। স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াতেই টেলিফোনে হাত চাপা পড়ল, 'হরিব্‌ল্। আমার পক্ষে বোঝানো অসম্ভব। তুমি বোঝাও।'

'কে?'

'তোমার মা। আমাদের বাচ্চা হবে খবরটা দেওয়া দরকার। আফটার অল উনি ঠাকুমা।' রিসিভারটা রেখে পাশের কটে গড়িয়ে পড়ল স্বপ্না। লোভ সামলাতে পারল না নবকুমার। একটা হাত আলতো করে স্বপ্নার কোমরের চৌহদ্দিতে ঘুরিয়ে নিয়ে পেটের ওপর রাখল। হ্যাঁ, এটুকু করতে দিতে ওর আপত্তি হয় না।

'কে বলছ? মা?' রিসিভার তুলে প্রশ্ন করল নবকুমার। 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। ডাক্তার প্রেডিক্ট করেছে নাতি হবে তোমার। না না, তোমার বউমা ক্যারি করছে না। দ্যাখো ক্যারি করাটা বড় কথা নয়। আমার আর তোমার বউমার রক্ত নিয়ে ও আসছে এটাই বড় কথা। তুমি আশীর্বাদ করছো তো?' নবকুমার উত্তরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা

করল, 'না, না। এটা পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়। তোমার বউমার পক্ষে ক্যারি কবা ফিজিক্যালি এবং ইকনমিক্যালি অসম্ভব। বাস্তবকে অস্বীকার করে কি লাভ। বাচ্ছা ক্যারি করলে ওর শরীরের কমপ্লিকেশন বেড়ে যাবে। শী উইল লুজ হার ফিগার। আর অন্তত মাস ছয়েক ওকে বাড়িতে বসে থাকতে হবে। সেটাও অসম্ভব। হ্যাঁ, মারুতি কিনেছি আমরা। কি বললে? না না। ডাক্তার এবং এজেন্সি প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছে। আমার স্পার্ম, ওর ওভাম থেকেই শিশু আসছে। এ ব্যাপারে ক্যারিয়ারের কোন ভূমিকা নেই। জাস্ট ওর ওভারিতে প্লেস করে দেওয়া হয়েছে। আফটার অল উই আর পেইং ফর ইট। মা মা মা—। যাচ্চলে! লাইনটা কেটে গেল!' নবকুনার স্বপ্নার দিকে তাকাল।

স্বপ্না চোখ বন্ধ করে বলল, 'দিজ ওল্ড পিপল আর রিয়েলি ক্রেজি। আধুনিক ব্যাপারগুলো ওদের মাথায় কবে ঢুকবে কে জানে!'

দারুণ সেজেছে আজ স্বপ্না। নার্সিংহোম থেকে সোজা অফিসে চলে যাবে। নবকুমারের মনে পড়ল ছেলেবেলায় মা বিয়েবাড়িতে যাওয়ার সময়েও এত সুন্দর সাজতে জানতেন না। ডাক্তার খাসনবীশ ওদের দেখামাত্র অগ্রিম অভিনন্দন জানালেন, 'যা ভয় পেয়েছিলাম তা নয়, অপারেশন আটকাবে না। মিনিট চল্লিশেক অপেক্ষা করুন।'

স্বপ্না বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি হলে ভাল হয়। সাড়ে এগারটায় একটা কনফারেন্স আছে।'

এজেন্সির মালিক মিস্টার সেন এসে গেলেন, 'খুব তো চিন্তা করছিলেন। আরে আমার পছন্দ খারাপ নয়। চার-চারটে বাচ্চার মা। এসব ধকল কিছুই নয়।'

ওরা নারীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। একদিন নার্সিংহোমের তোয়াজ খেয়েই যেন চেহারা পাল্টে গেছে। পেট এখন পরিপূর্ণ। মিনমিনিয়ে বলল, 'আমার তো এমনিতেই হয় কর্পোরেশনের হাসপাতালে। পেট কাটবে কেন?'

স্বপ্না বলল, 'কোন অসুবিধে হবে না তোমার। একদম ফিট হলে

তবেই বাড়ি যাবে।'

নারী চোখ বন্ধ করল, 'এবার বড় জ্বালাচ্ছে।'

স্বপ্না চমকে জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বালাচ্ছে মানে? কে জ্বালাচ্ছে?'

নারী পেটে হাত রাখল, 'এইটে। কাল সারারাত লাথি মেরেছে।'

স্বপ্না হাসল, 'তা তো মারবেই। ফরেন ল্যাণ্ডে কে বেশি দিন থাকতে চায় বল। তুমি সকালে দুধটুধ খেয়েছ তো?'

ডাক্তার খাসনবীশ বললেন, 'ওসব চিন্তা করবেন না। ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে।'

স্বপ্নার বুকে ঢিপ ঢিপ, নবকুমারের হাতুড়ি পড়ছিল। অপারেশন চলছে। নবকুমারকে মিস্টার সেন বললেন, 'ওর স্বামী এসেছে। বাইরে থাকতে বলেছি।'

'ও।' নবকুমার কি বলবে ভেবে পেল না।

'আজই বাকি পেমেন্ট করে আপনাকে বিল পাঠিয়ে দেব।'

এই সময় ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, 'কনগ্রাচুলেশন। আপনাদের পুত্র হয়েছে।'

স্বপ্না সব ভুলে নবকুমারকে জড়িয়ে ধরল। নবকুমারের মনে হল এত আরাম সে কখনও পায়নি। স্বপ্না ছিটকে গেল ডাক্তারের কাছে, 'আমার ছেলেকে দেখব ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার বললেন, 'দাঁড়ান। ওয়াস করানো হচ্ছে। আট পাউণ্ড ওজন। রিয়েল হেলদি।'

নারীর চেতনা খুব দ্রুত ফিরে এল। সে মুখ ফিরিয়ে নার্সকে দেখতে পেয়েই ডাকল, 'আচ্ছা, আমার কি হয়েছে?'

নার্স গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'ছেলে।'

নারীর মুখে স্বর্গীয় আনন্দ ফুটে উঠল। তার শরীর মন্থন করে একটি শব্দ বেরিয়ে এল, 'আঃ!'

নার্স চমকে মুখ ফেরাল, 'কি হল?'

নারী বলল, 'পর পর চারটে মেয়ে হওয়ায় সবাই আমাকে খুব বদনাম দিচ্ছিল। এবার তো ছেলে হল। হলো তো! আমার ছেলেকে নিয়ে আসুন, একটু দেখব।'

নার্স দোনামনা করল। তারপর পাশের কট থেকে শিশুটিকে তুলে এনে নারীর সামনে ধরল। অপলক নারী তাকে দেখল। তার মুখে ঈশ্বর তখন নিজের শ্রেষ্ঠ সুখের ছবি আঁকবার চেষ্টা করছিলেন। নার্স বলল, 'দেখা হল?'

নারী আলতো আঙুলে কোনমতে শিশুকে স্পর্শ করে বলল, 'নাকটা আমার মত হয়েছে।'

ডক্টর খাসনবীশ বললেন, 'এভরিথিং অলরাইট, তবে আমি শিশুকে আরও তুদিন নার্সিং হোমে রাখতে চাই।'

একটু আগেই নবকুমার এবং স্বপ্না সন্তানদর্শন করে এসেছে। তুজনেই আবেগে টগবগ করছে এখন। ডাক্তারের কথাটা শুনে স্বপ্না আঁতকে উঠল, 'ওমা! কেন? নো ডক্টর, আই অ্যাম ডাইং ফর হিম। এখনই নিয়ে যাই।'

'তুটো দিন ধৈর্য ধরুন না। তদ্দিনে পৃথিবীর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাক। কেমন দেখলেন?'

'একদম স্বপ্নার মুখ বসানো।' নবকুমার জবাব দিল।

'মাতৃমুখী পুত্রসন্তান সুখী হয়।' ডাক্তার জবাব দিলেন।

'নাকটা কিন্তু ওর মত। ওদের বংশের যা ধারা।' স্বপ্না বলে উঠল, 'রঙ কেমন হবে ডাক্তার? আমার খুব ভয় করছে।'

'ভয় করছে কেন?'

'মানলাম আমার আর নবুর ক্রিয়েশন কিন্তু এনভায়রনমেণ্টের একটা প্রভাব আছে তো? দশ মাস ওই রোগা-অশিক্ষিত মেয়েটার শরীরে থেকে ও আবার কোনও ব্যাড হ্যাবিট আর্ন না করে বসে!' স্বপ্না শিউরে উঠল।

ডাক্তার হাসলেন, 'শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে একমাত্র মা-বাবার রক্তের কাছেই ঋণগ্রস্ত থাকে। ওই দশ মাস তার স্মৃতিতে চিরদিনের মতই অন্ধকারে। যেমন ধরুন নার্সারিতে গেলে দেখতে পাবেন বীজ থেকে

চারাগাছ তৈরি করতে একটা টেম্পরারি বেডের প্রয়োজন হয়। এইটে সেই রকম। দুদিন পরে আপনাদের সন্তান আপনারা নিয়ে যাবেন, আপনারা যেভাবে মানুষ করতে চাইবেন তাই হবে।'

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে আসার মুখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। সেই শুঁটকো লোকটা বিড়ি টানছে। ওদের দাঁড়াতে দেখে এগিয়ে এল, 'সেন সাহেব বলে গেলেন ভাল আছে। আপনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

স্বপ্না বেমালুম জবাব দিল, 'না, ডাক্তার নিষেধ করল। ঘুমোচ্ছে।'

'ও! ছেলে হয়েছে শুনলাম!' লোকটি হাসল।

'হ্যাঁ।' নবকুমার বলল, 'আমরা সব টাকা পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে সুস্থ হলে নিয়ে যেও। আচ্ছা, চলি ভাই।'

'তা তো যাবেন কিন্তু এদিকে যে একটা মুশকিল হয়ে গেল!'

'কি মুশকিল?'

'পেট কাটতে বললেন কেন? একবার পেট কাটলে দু বছরের মধ্যে পেটে বাচ্চা নেওয়া যায় না। শুনেছি সামনের বছর থেকে রেট ডাবল হয়ে যাবে। এক বছর বেকার থাকব, এই ক্ষতিপূরণটা আপনারা করে দেবেন।' লোকটা হাত কচলালো।

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল। স্বপ্না বলল, 'তুমি আবার ওকে ক্যারি করাবে?'

'সেইজন্যেই তো আমরা আছি।'

'বেশ। আমি মিস্টার সেনের সঙ্গে কথা বলব।' ওরা দ্রুত মারুতিতে উঠে বসল।

লিফটম্যান একটা কিশোরীকে দিয়েছে। সে শিশুকে দেখাশোনা করবে ওরা বাড়িতে থাকলে। অফিসে বের হবার সময় মিসেস পালিতের ক্রেশে দিয়ে যাবে ওকে। ফেরার সময় নিয়ে আসবে। সমস্যা হল মিসেস পালিত দু'মাসের নিচের বাচ্চাদের রাখেন না। এই দু'মাস কি করা যায়? বারো বছরের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিশোরীকে স্বপ্না বারংবার জিজ্ঞাসা করেছে সে দু'মাস ম্যানেজ করতে পারবে কিনা। কিশোরী মাথা নেড়েছে।

গ্রামের বাড়িতে সে কত শিশুকে ঘুম পাড়িয়েছে। স্বপ্না অবশ্য তাতে ভোলার পাত্রী নয়। সে ডক্টর খাসনবীশের কাছ থেকে শিশুর পরিচর্যা পদ্ধতি বিস্তারিত লিখে নিয়ে এসেছে। শনিবার-রবিবার তার ছুটি থাকে। অতএব শনিবার সকালেই শিশুটিকে নিয়ে আসা হল।

বাড়িতে যেন উৎসব। নতুন ফ্ল্যাটে শিশুর কান্না, স্বপ্নার ব্যস্ততা, নবকুমারের খুব ভাল লাগছিল। স্বপ্না সমস্ত শরীর একটা সাদা অ্যাপ্রনে জড়িয়ে পাতলা করে বেবিফুড় গুলে শিশুর মুখে বোতলটা ধরে বলল, 'সোনামণিটা, খেয়ে নাও।'

শিশু দুবার ঠোঁট ফোলালো, জিভ ছোঁয়ালো এবং ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্না খুব নিরাশ হল। নবকুমার বলল, 'ডার্লিং, ঠিক তোমার স্বভাব পেয়েছে। তুমি যেমন খাবারের নামেই আঁতকে ওঠো—।'

স্বপ্না বলল, 'ডোণ্ট বি সিলি। আমাকে ফিগার রাখতে হয়। একে খাওয়াতেই হবে। একটু পরে চেষ্টা করব। কি মিষ্টি দেখতে, না?'

'কোলে নিও না। তোমার শাড়ি নষ্ট করবে।'

'করুক।' স্বপ্না আরও ঝুঁকে পড়ল।

তিনটে নাগাদ ডাক্তার ছুটে এলেন। স্বপ্না উদ্‌ভ্রান্ত, নবকুমার কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। শিশুটিকে দেখে ডাক্তার বললেন, 'একটু ভুল হয়ে গিয়েছে।'

দুজনেই একসঙ্গে জানতে চাইল, 'কি?'

'নার্সকে বলে দিইনি যে ওকে যেন মায়ের দুধ না খাওয়ায়। এই কদিনে সেই অভ্যেসটা হয়ে যাওয়ায় ও বেবিফুড খেতে চাইছে না।'

স্বপ্না এবং নবকুমার পরস্পরের দিকে তাকাল। এই সময় বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠতেই কিশোরী বোতলটা মুখে ধরতেই সে প্রতিবাদ করল। এখন আর ওর কান্না থামছে না। স্বপ্না পাগলের মত ডাক্তারকে একটা রাস্তা বের করতে বলল। এত কষ্টের সন্তান যদি না খেয়ে মরে যায় তাহলে—?'

ডাক্তার খাসনবীশ বললেন, 'ব্রেস্ট মিল্ক আর বেবিফুড একসঙ্গে

অভ্যেস করাতে হবে। প্রথমটাকে বন্ধ করলে তখন দ্বিতীয়টাকে খেতে আপত্তি করবে না। দেখি কি করা যায়। আপনি বরং একবার এজে-ন্সিকে ফোন করুন।

নবকুমার মিস্টার সেনকে ধরল, 'একটি মেয়ে দিন যে আমাদের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারে। মানে বুকের দুধের দরকার।'

মিস্টার সেন টেলিফোনে বললেন, 'দিনে কুড়ি টাকা দিতে হবে।'

'তাই সই।'

স্বপ্না বলল, 'বলে দাও, একটু ভদ্র-সভ্য যেন হয়।'

মিস্টার সেন শুনে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এ রেওয়াজ তো চিরকাল এদেশে আছে।'

দরজা খুলে শুঁটকো লোকটাকে দেখে চমকে উঠল নবকুমার, 'কি ব্যাপার?'

'বুকের দুধ দরকার,' সেন সাহেব বলেছেন।

'হ্যাঁ। কিন্তু—।'

'হাঁটাচলা করছে, সেলাই কেটে দিয়েছে যখন, তখন ওকেই নিয়ে এলাম।'

নবকুমার দেখল নারী কিছু দূরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে। অগত্যা সে ভেতরে আসতে বলল। স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'এত বড় অপারেশনের পর হাঁটা-চলা করছ?'

শুঁটকো বলল, 'গরিব মানুষের সব করতে হয়।'

শিশু মাতৃদুগ্ধের স্পর্শ পেয়েই আপ্লুত হল। স্বপ্না ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'নবু, অন্য ঘরে যাও।' নবকুমার দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল। স্বপ্না তাকে অনুসরণ করল,' একে পাঠানো উচিত হয়নি। নিজের ছেলে বলে ক্লেম করে না বসে।'

'ব্রেস্ট মিল্ক দরকার যে।' নবকুমার বিড়বিড় করল, 'কনসিভ না করলে যে শরীরে মিল্ক তৈরি হয় না। না হলে তো তুমিই—।'

'নবু!' ধমকে উঠল স্বপ্না, 'বড্ড স্ল্যাঙ বলছ তুমি আজকাল।'

শিশু ঘুমিয়ে পড়লে শুঁটকো বলল, 'এবার আমরা উঠি।'

'আবার কখন আসবে?'

'রাত্রে তো আসা সম্ভব নয়। তাহলে তো ওকে রেখে যেতে হয়।'

'মাঝে মাঝেই দরকার হবে যে।'

'তা হবে। তবে খাওয়াপরা ছাড়া চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করলে চল্লিশ টাকা পড়বে।' জানিয়ে দিয়ে শুঁটকো চলে গেল।

নারীর থাকার ব্যবস্থা করে দিল স্বপ্না। শুধু খাওয়ানোর সময় ছাড়া নারী যেন বাচ্চার কাছে না আসে জানিয়ে দিল।

মধ্যরাত্রে শিশু কেঁদে উঠতেই নবকুমার লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল। ওপাশের বিছানায় শোওয়া স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'ও কাঁদছে।'

স্বপ্না এবং নবকুমার শিশুর পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো মুষ্টিবদ্ধ হাত, শিশু কেঁদে চলেছে। স্বপ্না বলল, 'আজ পাঁচবার খেয়েছে। ওর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট পাঁচবার খাওয়াবে। এ দেখছি সর্বভুক।'

নবকুমার বলল, 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে তাই কাঁদছে। ওকে ডাকো না।'

স্বপ্না পাশের ঘরে ঢুকে দেখল নারী অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাকে জাগিয়ে প্রস্তাবটি নিবেদন করতেই সে মুখ ফেরাল, 'ছিবড়ে করে দিল, ছিবড়ে করে দিল।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল স্বপ্না।

'এর আগে চার চারটে আমাকে ছিবড়ে করেছে। ওদের মুখে তো বুকের দুধ ছাড়া কিছু দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এও আমাকে শেষ করবে। কিন্তু আমার তো দিনে পাঁচবার, কোটা পূর্ণ হয়ে গেছে আজ।' নারী পাশ ফিরে শুল।

'কিন্তু ও যে কাঁদছে!' আঁতকে উঠল স্বপ্না।

'কাঁদুক।' নারী আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রেম

অনেকদিন পরে সুপ্রভাতের সঙ্গে দেখা। ধর্মতলায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে পার্থ না?'

সত্যি বলব, আমি একটু ধন্দে পড়েছিলাম। এই গোলগাল লালটু চেহারা দেখে চিনে নাম বলব এমন ক্ষমতা আমার ছিল না। হয়তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল। এগিয়ে এসে বলল, 'যাচ্চলে! এর মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলে? আমি সুপ্রভাত। টমোরি মেমোরিয়াল হোস্টেল—।'

এবার মনে পড়ে গেল। কিন্তু সেসময় তো এরকম চেহারা ছিল না ওর! কুড়ি বছরে একটা লিকলিকে শরীরে যদি এত মেদ জমে তাহলে আমার দোষ কি। আদ্যোপান্ত সুখী চেহারার মালিক সুপ্রভাত বলল, 'তুমি ভাই একটুও পাল্টাওনি।'

এবার ছবিগুলো স্পষ্ট হচ্ছে। হোস্টেলে একদম পাত্তা দিতাম না ওকে আমরা। তবে সেবার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে মেয়ে আনতে না দেওয়ায় আমাদের নাটকে ও নায়িকা সেজেছিল। সেই মেয়েলি ঢংটা এখনও আছে দেখছি।

বললাম, 'আরে ব্বাস, তুমি দেখছি দারুণ মোটা হয়ে গেছ!'

'আর বলো না, বিয়ের পর থেকেই এই অবস্থা। তুমি বিয়ে করোনি?

'নাঃ, কপালে লেখা নেই। কি করছ এখন?'

'কিছুই না তেমন। মানে ও আমাকে কিছু করতে দেয় না।'

'সে কি?'

'আর বলো না, সারাদিন বাড়িতে থাকতে হবে আর উনি আমাকে দেখবেন। ছবি আঁকে তো! এই সেদিন দিল্লীতে একজিবিসন সেরে এল। তোমারও তো খুব নাম শুনি আজকাল। খুব লিখছ!'

'কই আর তেমন !'

'থাক, আর বিনয় করতে হবে না। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?'

'আড্ডা মারতে।'

'বাঃ, ভাল হল। আমাদের ওখানে আড্ডা মারবে চল।'

সুপ্রভাত ছাড়ল না। ধর্মতলার নামী দোকান থেকে ফর্দ মিলিয়ে রং কিনে ট্যাক্সি ডাকল। বেশ মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে ওর শরীর থেকে। চার্লি কিংবা ব্রুট হবে হয়তো। ঠাট্টা করার জন্যে বললাম, 'তোমার স্ত্রী খুব সুগন্ধ ভালবাসেন, না ?'

ও যেন চমৎকৃত, বলল, 'কি করে বুঝলে ? ও, তুমি বোধ হয় ইভ্‌স উইকলি পড়েছ ? ওর ইন্টারভ্যু বেরিয়েছে। হ্যাঁ, রোজ নিজের হাতে আমার গায়ে স্প্রে করে দেয় ভাই, খুব শৌখিন তো !'

বিড়লা প্লানেটোরিয়াম ছাড়িয়ে ট্যাক্সি বাঁদিকে বাঁক নিল। এ তল্লাট কোলকাতার চূড়ান্ত খানদানী। সুপ্রভাত পকেট থেকে ডানহিল বের করে একটা এগিয়ে দিল, 'এ পাড়ায় কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না ভাই।'

'ভালই তো। আয়ু বাড়ে।' বললাম। কিন্তু এই অঞ্চলে থাকার জন্যে সুপ্রভাতকে হিংসে করতে শুরু করেছি বুঝতে পারলাম।

ট্যাক্সি যে বাড়িটার সামনে ছেড়ে দিল সেটি বাইরে থেকে আহামরি কিছু দেখতে নয়। গেট খুলে ছোট্ট একটু বাগান এবং তার পরেই তিনটে সিঁড়ি ভেঙে দোতলা বাড়ির দরজা। বেল টিপে সুপ্রভাত হাসল, 'আজ ওকে চমকে দেব। আমার কোন বন্ধুকে তো এর আগে এখানে নিয়ে আসিনি।'

'কেন ? উনি কি নিষেধ করেছেন ?'

'না না। তবে ও চায় ওর নিচের স্ট্যাটাসের কাউকে যেন না নিয়ে আসি।'

একটি অল্পবয়সী মেয়ে দরজা খুলে দিল। সুপ্রভাত জিজ্ঞাসা করল, 'মেমসাব কোথায় ?'

মেয়েটি হেসে ডানদিকটা দেখিয়ে ভেতরে চলে গেল। সুপ্রভাত কৃতার্থ ভঙ্গীতে বলল, 'আঁকছে। তুমি একটু বসো, আমি খবর দিইগে।'

বাধা দিতে চেষ্টা করলাম, 'আঁকার সময় বিরক্ত করছো কেন ?'

সুপ্রভাত বলল, 'তাতে কিছু হবে না।'

সুপ্রভাত চলে গেলে আমি একটি সুন্দর সোফায় বসলাম। বেশ বড় হলঘর, মেঝের ওপর বেশ পুরু কার্পেট পাতা। দেওয়াল জুড়ে বিরাট বিরাট তেলরঙের ছবি। বেশীর ভাগই ঘোড়ার মুভমেণ্টের ওপর ঠিক ডান দিকে দুটি ঘোড়ার মৈথুন দৃশ্য চমৎকার। স্ত্রী-ঘোড়াটি কি নিরীহ মুখে দাঁড়িয়ে, যেন পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তাতে তার কিছুই এসে যায় না। পুরুষটির সারা শরীরে ছন্দ লীলা করছে। সবই সুপ্রভাতের স্ত্রীর আঁকা। সত্যিই গুণী মহিলা। ছোকরা বেশ ভাগ্যবান। ঘরের ঠিক মাঝামাঝি দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা চা গাছের গুঁড়ি কাটা টেবিলের ওপর চোখ পড়তেই বিস্মিত হলাম। পাশাপাশি দুটি সুন্দর ফ্রেমে দুজন সুপুরুষ যুবক হাসছে। উজ্জ্বল শব্দটি এদের দেখলেই মনে পড়ে যাবে ছবি দুটোর গায়ে দুটো বেলফুলের মালা ঝোলানো। এই দুই যুবক মার গেছে ? সুপ্রভাতের কে হয় এরা ? কোন অ্যাক্সিডেণ্ট ? তাহলে এই বাড়িতেও দুঃখ আছে ! ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে খুব খারাপ লাগছিল

একটু বাদেই ফিরে এল সুপ্রভাত, 'কি খাবে বল ?'

'কিছু না।'

'তাই বললে চলে ! তোমায় কদ্দিন বাদে দেখলাম !'

'তুমি এখন কি করছ ?'

'আমি ? আমায় তো কিছু করতে হয় না। বাবা যা রেখে গেছেন তার সুদে বেশ চলে যায়।' সুপ্রভাত হাসলো।

'তোমার ভাই-বোন নেই ?'

'না। এখন সব কিছু আমাদের নামে জয়েণ্ট করে নিয়েছি।'

এই সময় তিনি এলেন। পৃথিবীতে কাকে সুন্দরী বলা যায় আমি জানি না। কিন্তু এঁর চেয়ে সুন্দরী রমণী আমি দেখিনি। অথচ নাক চোখ ঠোঁট কাব্যের নায়িকাদের মত নয়। চোখ পটলচেরা নয় কিন্তু পাতাজোড়া বেশ বড়। নাক ঈষৎ চাপা। ঠোঁট দুটো যথেষ্ট পুরু। কিন্তু সব মিলিয়ে, তাকানোর ভঙ্গীতে, পদক্ষেপে এমন একটা মাদকতা আছে যে শরীরে

শিরশিরানি ওঠে। দ্রৌপদী কিংবা ক্লিওপেট্রার গায়ের রঙ ফরসা ছিল না। এঁর যেন অনেকটা ইস্পাতের মত, এঁর মত কিনা জানি না। পরনে টাইট জিনসের প্যাণ্ট আর কল্কেতোলা পাঞ্জাবি। একটা হাত তার কনুই অবধি গোটানো। পায়ে কিছু নেই এবং মাথার চুল প্রায় হাঁটু অবধি নেমে এসেছে পিঠ ভাসিয়ে। ওঁর এগিয়ে আসা দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

সুপ্রভাত তাঁকে দ্যাখেনি। কারণ আমরা মুখোমুখি সোফায় বসে-ছিলাম। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে তিনি সুপ্রভাতের দুই কাঁধে হাত রেখে হাসলেন, 'তোমার বন্ধু ?'

দেখলাম এককুচি গজদন্ত চলকে উঠল। হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো সুপ্রভাত, 'তুমি এসে গেছ ! আলাপ করিয়ে দিই, আমার বন্ধু পার্থ সেন, খুব নামকরা লেখক, আমরা একসঙ্গে স্কটিশে পড়তাম।'

'আ—চ্—ছা ! আপনিই পার্থ সেন ? উঃ, আই লাইক য়ু, আপনার লেখা আমার ভীষণ ভাল লাগে। ইণ্টারেস্টিং।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

সুপ্রভাত বলল, 'নন্দিতাও খুব গুণী মেয়ে। দারুণ ছবি আঁকে।'

এই প্রথম এমন যুবতী মহিলা আমার প্রশংসা করলেন। মনে হল আমি মরে গেছি। কোনরকমে হাত স্পর্শ করলাম। এত তপ্ত অভিনন্দন আমি কখনো পাইনি। নন্দিতা ঘুরে এসে সোফায় বসলেন সুপ্রভাতের পাশে, 'তোমার বন্ধু এতদিন আসেননি কেন ? এ ক' বছরে তো দেখিনি !'

'আরে, আমিই কি জানতাম আমাদের পার্থ আর পার্থ সেন এক লোক ? দেখা হতে জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।'

নন্দিতা আবার হাসলেন, 'আপনার 'ত্রিশঙ্কু' আমার ফ্যাণ্টাস্টিক লেগেছে। ওটার ফিল্মও ভাল হয়েছিল।'

সুপ্রভাত বলে উঠল, 'তোমার গল্প সিনেমা হয়েছে ?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ।

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কি কি হচ্ছে ?'

হচ্ছে না, শুধু কথাই চলছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই সত্যটা বলতে

ইচ্ছে করল। যেন কিছুই নয় এমন ভঙ্গী করে বললাম, 'আরো গোটা চারেক!'

'আ-চ্ছা!' নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তাহলে তো আপনি বড়লোক!'

'মোটেই নয়, গরীব লেখক!'

আমার বলার ভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল যে নন্দিতা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। ওঁকে যত দেখছি তত সুপ্রভাতের ওপর হিংসে হচ্ছে। যৌবন শব্দটাকে কেউ যেন ফেবিকল দিয়ে সেঁটে দিয়েছে নন্দিতার শরীরে। এরকম স্ত্রী পাওয়ার মত ভাগ্য ক'জনের হয়?

নন্দিতা বললেন, 'কি খাবেন বলুন?'

সুপ্রভাত আর একটা ডানহিল আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, 'আমি বলেছি, উনি রাজি হননি। ছ্যাখো, তুমি যদি রাজি করাতে পারো।'

সিগারেট ধরিয়ে এবার আর না বলতে পারলাম না, 'যাহোক কিছু।'

নন্দিতা সামান্য ঝুঁকে সুপ্রভাতকে প্রায় নিঃশব্দে কিছু বললেন। এবং ওই মুহূর্তে ওঁর নীচু হওয়া উর্ধ্বাঙ্গে আমার চোখ পড়তেই যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। এক আকাশে পাশাপাশি কোন গ্রহে তুটি পূর্ণচন্দ্র উদিত হল জানি না, তবে আমি অবশ্য খণ্ডগ্রহণ দেখতে পেলাম। আমার সমস্ত বাগানে যেন নষ্টচন্দ্রের চুরি হয়ে গেল আচম্বিতে।

সুপ্রভাত উঠে গেলে উনি আমার দিকে তাকালেন। আমার মুখে কি শরীরের সব রক্ত? এই চল্লিশে? আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে সহজ হবার ভান করলাম, 'আপনি আঁকছিলেন, ডিস্টার্ব করলাম।'

'মোটেই নয়। আমি যখন-তখন আঁকতে পারি, মুডের দরকার হয় না। অবশ্য খুবই বাজে আঁকি!' নন্দিতা কাঁধ নাচালেন।

'বিনয় অবশ্য বিদ্বানের ভূষণ। ওই দেওয়াল তার সাক্ষী দেবে।'

'ভাল লাগছে ছবিগুলো!' নন্দিতা এবার উঠে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁর সামনে একরাশ ঘোড়া ঝরণায় মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, কিন্তু একটি সাদা ঘোড়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। সে তার প্রতিবিম্ব জলেতে দেখছে। নন্দিতা কেমন বিষণ্ণ গলায় সেদিকে তাকিয়ে বললেন,

'কেউ কেউ কি রকম আলাদা হয়, না?'

আমি কাছে গিয়ে ছবিটাকে দেখলাম। বেশ ভাল ছবি। দারুণ জীবন্ত। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আপনার মনের ভেতরে কোথাও যেন দুঃখ আছে।'

'উম্?' নন্দিতা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপরেই ওঁর মুখের চেহারা পাল্টে গেল। হাসতে হাসতে বললেন, 'যাঃ!'

তারপরেই সরে গেলেন সেই মৈথুন ছবিটির দিকে, 'মন রেখে কথা বলবেন না। এটা কি ছবি হয়েছে?'

'বিউটিফুল।'

ঘাড় ঘুরিয়ে চোখের কোণে তাকালেন তিনি, 'হোয়াই?'

'ওদের অ্যাকসন যেন কবিতার মত।'

'গড্! আপনি কি বিবাহিত?'

'না, সেই সৌভাগ্য হয়নি!'

'ওমা, সে কি! এ পোড়া দেশে আপনার মেয়ে জুটল না?'

'তাই তো দেখছি। ফুল তো অনেক ফোটে, কিন্তু গোলাপ?'

'উঁহু, এটা পুরনো উপমা। তাছাড়া গোলাপের রঙ এবং গন্ধ ছাড়া অন্য কোন চার্ম নেই। বলুন জলপদ্ম। পেতে হলে সাঁতার জানতে হয়। সাঁতার শিখুন, বুঝলেন মশাই!'

এই সময় সুপ্রভাত সেই মেয়েটিকে নিয়ে ফিরল। মেয়েটির হাতে কাশ্মিরী ট্রের ওপর শিভাস রিগালের বোতল এবং দুটো সুন্দর গ্লাস আর বরফ। টেবিলে ওগুলোকে সাজিয়ে মেয়েটি চলে গেল। নন্দিতা ফিরে গিয়েছিলেন সোফায়। প্রায় সোয়া পেগ করে তরল পদার্থটি গ্লাসে ঢেলে তাতে কুচি কুচি বরফ ছড়িয়ে দিতে লাগলেন চামচে তুলে।

আমি একটু থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। ওঁরা আমাকে যে ড্রিঙ্ক করার কথা বলছেন তখন বুঝতে পারিনি। মদ্যপান সম্পর্কে আমার কোন বিতৃষ্ণা নেই। মাঝে মধ্যে শখে পড়ে খেয়ে থাকি আমি। তবে আজ অবধি কোন নেশায় আমি আসক্ত হইনি। কিন্তু সুপ্রভাতের এখানে যে খোদ বিলিতি দ্রব্য খাওয়া হয় তা ভাবতে পারিনি।

নন্দিতা ডাকলেন, 'আসুন।'

আমার গ্লাসটা ওঁর হাতে। তুলে দেবেন বলে অপেক্ষা করছেন। আপত্তি করলাম না। তবে স্পর্শ বাঁচিয়ে তুলে নিতেই নন্দিতা 'চিয়াস' বলে অন্য গ্লাসটা ঠোঁটে ছোঁয়ালো। আমি সুপ্রভাতের দিকে তাকালাম। সে নির্বিকার মুখে বসে আছে। গ্লাস যখন দুটো তখন ও খাচ্ছে না নিশ্চয়ই। প্রশ্ন করলাম।

নন্দিতা জবাব দিলেন, 'ওর দ্বারা হবে না। দেড় পেগ খেলেই বমি করতে শুরু করে। রিয়েল গুডি বয়।'

লাজুক মুখ করে সুপ্রভাত জানালো, 'আমি পারি না।'

সেদিন আমরা তিন পেগ খেয়েছিলাম। নন্দিতার ইনটেলেক্ট আমাকে মুগ্ধ করছিল। পৃথিবীর অনেক বিষয় সম্পর্কে সমান আগ্রহ ওর এবং বোঝা যাচ্ছিল পড়াশুনার অভ্যেস আছে। বেচারা সুপ্রভাত যে এই ব্যাপারে নিতান্তই শিশু তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। ওঠার সময় নন্দিতা বারংবার আমায় অনুরোধ করলেন ওঁদের সঙ্গ দেবার জন্যে। সুপ্রভাত আমাকে ট্যাক্সি অবধি এগিয়ে দিল।

ক'দিন থেকেই নন্দিতাকে মনে পড়ছে। চলে আসার সময় একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েছিলাম। নন্দিতা আলতো করে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই ছবিটা ভুলতে পারছি না। যেতে ইচ্ছে করছে খুব কিন্তু সঙ্কোচও হচ্ছিল। কেন হচ্ছিল জানি না, হয়তো অপরাধবোধ থেকেও এরকমটা হতে পারে। আবার কি অপরাধ করেছি তাও বুঝতে পারছি না। এ এক বিচ্ছিরি অবস্থা।

দিন দশেক বাদে আবার এক বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম। অস্বস্তির কোন কারণ ছিল না যদিও, তবু—। বেল টিপতে সেই মেয়েটি এল। আমার দিকে তাকিয়ে সে যেন বিস্মিত হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওঁরা আছেন?'

আমি সুপ্রভাত বলতে পারতাম কিংবা নন্দিতাও, কিন্তু মুখ থেকে কোন নাম বের হল না। মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, 'না, নেই।'

'ও, বলো, আমি এসেছিলাম।'

রাস্তায় নেমে মনে হল যাক বাঁচা গেল। আমি যে আসিনি এ অভি-যোগ কারো করার থাকবে না। পরক্ষণেই মনে হল মেয়েটিকে তো আমার নাম বলে আসা হয়নি। ও কার কথা ওদের জানাবে? সেদিন কি ও আমার নাম জেনেছিল এবং জানলে এতদিন মনে রাখবে কি উদ্দেশ্যে? ফিরে যাব বলে যেই কয়েক পা এগিয়েছি অমনি আমার নামটা চিৎকৃত হতে শুনলাম। ট্যাক্সির জানলায় নন্দিতার মুখ। আমাকে দেখে হাত নাড়ছেন।

ভাড়া মিটিয়ে পথে নেমে বললেন, 'কি, এদিক দিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর আমাদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে না, না?'

'আপনাদের ওখানেই গিয়েছিলাম।'

'ওমা! তাই নাকি! কি কপাল আমার!' তারপর মিষ্টি হাসলেন, 'আসুন। আর আপনাকে পালাতে দেব না।'

সেই মেয়েটি দরজা খুলে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। লক্ষ্য করলাম এ সুপ্রভাতের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে নন্দিতার সঙ্গে তেমন নয়। নন্দিতাকে যেন বেশ ভয় করে মেয়েটি। নন্দিতা ওকে যেন লক্ষ্যই করলেন না, আমায় বললেন, 'চলুন. আমার স্টুডিওতে গিয়ে বসি।'

'গুড! আপনার স্টুডিও দেখার লোভ ছিল আমার।'

দুটো ঘর পেরিয়ে একটি বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে এলাম আমরা। নন্দিতা সুইচ টিপতেই দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। দেখলাম ঘরময় ছড়ানো রঙ, ইজেল, স্ট্যাণ্ড। এখানে-ওখানে কিছু ছবি পুরো আঁকা, কোনটা শেষ হয়নি। এখন বোধ হয় একটি নগ্ন নারী এবং অস্থির ঘোড়া আঁকছেন নন্দিতা। কাজ শেষ হয়নি এখনো। অর্ধেক আঁকা ছবিকে কেমন ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। ঘরের একপাশে একটি সুন্দর ডিভান। বোধ হয় ওখানেই বিশ্রাম নেন নন্দিতা। আমায় সেটা দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

আমি ছবিগুলো দেখতে দেখতে আচম্কা প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আপনি ঘোড়াকে কেন সাবজেক্ট করলেন?'

আজ নন্দিতার পরনে হাতকাটা ম্যাক্সি। প্রশ্ন শুনেই কোমরে হাত

রেখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'অনুমান কি বলে ?'

যেটা ভেবেছি সেটা বলতে সঙ্কোচ হল। তাই একটু চিন্তিত এমন ভান করলাম।

নন্দিতা হাসলেন, 'ঘোড়া হল বীর্য, শক্তি আর সৌন্দর্যের প্রতীক। ওর প্রতিটি মুভমেণ্ট এমন একটা রাজকীয় ছন্দে গড়া যা অন্য কারো মধ্যে আমি দেখিনি। তাছাড়া একটা প্রিমিটিভ ব্যাপার ওর মধ্যে আছে।'

'আর ওই নারী ?'

'এরকম শক্তিই তো নারীর কাম্য !' তারপর হেসে বললেন, 'মিনমিনে পুরুষ আমার একদম ভাল লাগে না।'

শোনামাত্র সুপ্রভাতের কথা আমার মনে পড়ে গেল। কথাটা কি নন্দিতা স্বামীর উদ্দেশে বললেন ? এত বছরেও তো সুপ্রভাতের মেয়েলী স্বভাব একটুও পাল্টায়নি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুপ্রভাতকে দেখছি না !'

চোখের কোণে আমায় দেখলেন নন্দিতা, 'ওকে দিল্লীতে পাঠিয়েছি। আমার কিছু ছবি ওখানে রয়েছে, সেগুলো আনার জন্যে গিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠল। এই বাড়িতে আর কে আছে জানি না, তবে সুপ্রভাত নেই।

নন্দিতা বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন !'

বললাম, 'আজ থাক। আর একদিন—।'

'বন্ধু নেই বলে অসহায় বোধ করছেন ? আপনাকে আমি—।'

'না না। আপনি অন্য কিছু ভাববেন না। বেশ, বসছি।'

নন্দিতা আমার পাশে এসে বসলেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি তো আপনার ফ্যানই ছিলাম, কিন্তু দেখার পর মনে হয়েছিল আমি বন্ধুও হতে পারি। ভুল করেছি ?' নন্দিতা আমার দিকে যে চোখে তাকালেন তাতে পৃথিবীর সব বাঁধ ভেঙে যাবে নিমেষে।

বললাম, 'কক্ষনো না। আপনার বন্ধুত্ব পেলে আমি কৃতার্থ হব।'

নন্দিতা আলতো হাত রাখলেন আমার হাতে এবং আমি বুঝলাম আমার মরণ হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতা বলে উঠলেন, 'কি খাবেন বলুন ?'

'উহুঁ ! আজ আমি খাওয়াবো। চট্‌পট রেডি হয়ে নিন।'

'সে কি ! কেন ?'

'বাঃ ! আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন, সেলিব্রেট করব না ? কোন কথা নয়। বাইরে খাবো আজকে।'

নন্দিতার আপত্তি শুনলাম না। ও যখন তৈরী হয়ে এল দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। আকাশী বেনারসী যেন ওর অঙ্গে উঠে ধন্য হয়ে গেছে। নন্দিতার চোখে লজ্জা, 'কি দেখছেন ?'

'সুন্দর কাকে বলে !'

'কেউ যদি আবিষ্কার না করে তাহলে সুন্দর কি সুন্দর হয় ?'

সেদিন আমরা সবচেয়ে ভাল সময় কাটিয়েছি। থিয়েটার রোডের একটা নির্জন বার কাম রেস্তোরাঁতে তিনটে করে বিয়ার খেয়েছিলাম আমরা। এতে অবশ্য আমার পা কাঁপছিল আর কথা ভারী হয়ে আসছিল। রাতের খাবার খেয়ে আমরা যখন ট্যাক্সিতে ফিরছি তখন নন্দিতা আমার কাঁধে মাথা রাখল, 'এই, তুমি আমাকে ফেলে যেও না।'

আমি আর পারলাম না। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, 'না, কক্ষনো নয়।'

দেখলাম নন্দিতার হুঁশ ছিল। নিজেকে সুন্দর করে ছাড়িয়ে নিল সে আমার বন্ধন থেকে, 'উঁহু, দুষ্টুমি করবে না। আমি থামতে পারব না তাহলে !'

'থামবার দরকার কি ?'

'এভাবে নয়, মদের নেশায় নয়।'

ওর বাড়ির সামনে এসে ও নেমে গেল গাড়ি থেকে, 'আমাকে ছুঁয়ে বলো আবার কবে আসবে ?'

'যবে বলবে ?'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কাল। না, পরশু। পরশু বিকেলে এসো। লক্ষ্মীটি।'

ঝড়ের মত ছটা মাস আঙুলগলা জলের মত বেরিয়ে গেল টের পাইনি। আমার প্রতিটি মুহূর্ত এখন নন্দিতায় ছেয়ে আছে। কিছুদিন হল সুপ্রভাত খুব গম্ভীর। ও কি আমাকে সন্দেহ করছে? করলেও কেয়ার করি না। ওরকম মেয়েলী স্বভাবের ছেলেকে নন্দিতার সঙ্গে মানায় না। কিছুদিন হল, আমি গেলে সুপ্রভাত আর আমার সামনে আসে না। আমরা স্টুডিওতে বসে গল্প করি। অদ্ভুত স্বপ্নের মত মনে হয় এক একটা দুপুর।

এক সকালে নন্দিতা চলে এল আমার মেসে। সচরাচর ও এখানে আসে না, আমি যাই। অবাক হয়ে শুধোলাম, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি। এবার তৈরী হও।'

'মানে?'

'শেষ পর্যন্ত তিনি চলে গেছেন। মেদিনীপুর না কোথায় একটা মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছেন। আমি মুক্ত। এখন আইনের ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেললেই হয়।'

নন্দিতা একটু যেন আনমনা। কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ড আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বললাম, 'নন্দিতা, তুমি সুখী হবে তো?'

সে হাসল, 'জানি না সুখ কাকে বলে! সারাজীবন তো সুখ খুঁজে বেড়ালাম। জানি না আমার ভাগ্যে আছে কি না!'

'কিন্তু আমি তোমাকে সুখী করবই।'

'তুমি তো আমার সব কথা জানো না! জানলে যদি তোমার মত পাল্টে যায়! তুমি যদি পিছিয়ে যাও?'

'পাগল! আমি তোমার অতীত জানতে চাই না। যদ্দিন তুমি আমাকে ভালবাসবে তদ্দিন কেউ তোমাকে আমার পাশ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।' পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আমি উচ্চারণ করলাম।

দুপুরে আমরা ধর্মতলার একটা রেস্তোরাঁতে খাওয়া সারলাম। নন্দিতার একটু উকিলের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে এসো না। ভদ্রলোক আবার কি ভাববেন!'

'তাহলে?' ওকে আজ ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল না।

'তুমি একটা কাজ করতে পারবে ? ম্যু-মার্কেট থেকে একটা দশ বাই আট ছবির ফ্রেম কিনে আনবে ? খুব সুন্দর দেখতে যেন হয়। কিনে সোজা চলে এসো বাড়িতে। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরব।'

ম্যু-মার্কেটে গিয়ে সব চেয়ে সুন্দর এবং দামী ফ্রেমটি কিনে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে পড়ন্ত বিকেলে নন্দিতার বাড়িতে গেলাম। দরজা খুলল ও, খুলে হাসল। আজ ওর পরনে একটা হলুদ ম্যাক্সি। বলল, 'মনে হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই ঝামেলা চুকে যাবে।'

আমার খুব ইচ্ছে করছিল ওকে আদর করতে। ও বাধা দিল না। বলল, 'তোমার যেন আর তর সইছে না। এনেছ ? যা মাপ বলে-ছিলাম—।'

ফ্রেমটা ওর হাতে দিতেই ও ঘুরিয়ে দেখল। তারপর লম্বা পা ফেলে চা-গাছের গুঁড়িকাটা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর অন্য দুটি ছবির পাশে ফ্রেমটা রেখে মিলিয়ে দেখতে লাগল বেমানান হয়েছে কিনা। মাপ ঠিকই ছিল, ঘুরে বলল, 'ফাইন। তোমার পছন্দ আছে।' তারপর গলা তুলে ডাকল, 'কমলা, কমলা !'

মেয়েটি দৌড়ে এল। নন্দিতা রাগত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আজ মালা পাল্টাসনি কেন ? তোকে না বলেছি রোজ পাল্টাবি !'

মেয়েটি মাথা নীচু করে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে।'

'আর যেন না হয়। শুকনো মালাগুলো নিয়ে যা।'

ছবি থেকে সেগুলি খুলে মেয়েটি নিয়ে গেল।

আমি একটু বিষাদের গলায় শুধোলাম, 'মারা গেছেন ওঁরা ?'

মাথা নাড়ল নন্দিতা, 'না বোধ হয়।'

'তাহলে মালা দিচ্ছ ?'

'আমার কাছে মৃত।'

'কে ওঁরা ?'

'আমার দুই স্বামী। ডিভোর্স হয়ে যাওয়া মানেই তো মৃত্যু। তবু কারো কারো কিছু গুণও তো ছিল তাই মালা দিই।'

নন্দিতা আমার দিকে তাকাল। কিন্তু আমার চোখ তখন ছবি দুটির

দিকে। ছটো সুন্দর যুবক যেন আমার দিকে তাকিয়ে ভ্যাংচাচ্ছে। তার পাশেই দাঁত বের করা ফ্রেমটা যেখানে নিশ্চয়ই সুপ্রভাতের ছবিটা টাঙানো হবে।

আমার দৃষ্টি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সমস্ত পৃথিবী এখন টলছে। নন্দিতার গলা শুনতে পেলাম, 'পার্থ, তুমি কি হূর্বল হচ্ছ?'

না। আমি হূর্বল হচ্ছি না। কিন্তু আমি যে চোখ বন্ধ করেও একটি অদৃশ্য চতুর্থ ফ্রেম দেখতে পাচ্ছি।

নিজের ছবি

টেলিফোনটা আওয়াজ করে উঠতেই বিরক্ত হল সীতেশ। অপারেটরকে বলে দেওয়া ছিল এখন খুব জরুরী কলও সে অ্যাটেণ্ড করবে না। দ্বিতীয় টেলিফোনটির নম্বর খুব বেশি মানুষ জানে না। যাদের জানার কথা তারা এই সময় টেলিফোন করবে না। কাগজ থেকে মুখ না তুলেও সীতেশ বুঝতে পারল দ্বিতীয়টিতেই শব্দ হচ্ছে।

হরষিত সেন এতক্ষণ যে যুক্তিগুলো দিচ্ছিলেন তার একটার সঙ্গেও সীতেশ একমত নন। সোমনাথ অবশ্য চুপচাপ বসে আছে গোড়া থেকেই। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। হরষিত জুনিয়র মালিকের লোক, ওর খুঁটির জোর আছে। সীতেশ চটলেও কিছু হবে না তাঁর। আবার সীতেশকে সিনিয়র মালিক খুব পছন্দ করেন তাই সোমনাথ ওর বিপক্ষেও কিছু বলবে না। খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই মিটিং। সোমনাথ বলল, 'স্যার, টেলিফোনটা—।'

কুকুরের মত কেঁদে যাচ্ছিল যন্ত্রটা। এই উপমাটা অবশ্য সীতেশ অনেক ভেবে ঠিক করেছে। প্রথম কয়েকবার যখন রিং হয় তখন বেশ জোরালো আওয়াজ থাকে, যেন কে আছো তাড়াতাড়ি ধরো! মিনিট দুয়েক গেলেই শব্দটার চেহারা পাল্টে যায়। তখন ধমকানি থাকে না, কুঁই কুঁই করে প্রার্থনা করে, আমাকে তোল গো তোল।

বাঁ-হাত বাড়িয়ে রিসিভারটাকে তুলে আবার বসিয়ে দিতেই শব্দটা বন্ধ হল। সীতেশ বলল, 'আপনার সঙ্গে আমি একমত নই সেন। জানি না কার নির্দেশে আপনি এই সব বলছেন, কিন্তু আমাকে যদি কোম্পানি চালাতে হয়—।' সেই সময় আবার টেলিফোনটা শব্দ করে উঠল। সীতেশ কথা থামিয়ে এবার চেয়ার ঘুরিয়ে রিসিভারটা তুললে, 'হ্যালো, হু ত্থ হেল য়ু আর?'

এক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর কান্না জড়ানো গলাটা শুনতে পাওয়া

গেল 'সীতেশ !' সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল সে। তারপর গলাটা যথা-সম্ভব নরম করার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়েস !'

বলেই মনে হল সুনন্দাকে কখনো সে ইয়েস বলেনি টেলিফোনে।

সুনন্দার কান্নাটা আরো বাড়ল, 'সী-তে-শ !'

'হ্যাঁ, কি হয়েছে বল ?' বলতে বলতে সীতেশ টেবিলের উল্টোদিকের মুখগুলো দেখে নিল। সোমনাথ অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু হরষিত স্পষ্টত অসহিষ্ণু।

'সীতেশ, আমি কি করব ?' ডুকরে উঠল সুনন্দা।

'কি হয়েছে ?' সুনন্দা কাঁদছে এটাই সীতেশের কাছে বিস্ময়। ওর অভিজ্ঞতায় দুঃসাহসী মেয়ে হিসেবে সুনন্দার বিকল্প নেই।

'নীরেন—নীরেন—।' সুনন্দার কথাটা স্পষ্ট হল না।

'কি হয়েছে নীরেনের ?' এই নামটা সুনন্দার মুখে আশা করেনি সীতেশ।

'ও আত্মহত্যা করেছে।' এবার ভেঙে পড়ল সুনন্দা।

সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে গেল সীতেশ। মাথার ভেতরটা ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মত ফাঁকা হয়ে গেল এবং সমস্ত শরীরে একই সঙ্গে শীত-বোধ এবং ঘাম জমল। নীরেন আত্মহত্যা করেছে ? কি আশ্চর্য ব্যাপার ! ও অন্য যা কিছু করতে পারতো, কিন্তু আত্মহত্যা কেন ?

'আমি কি করবো সীতেশ ?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র সুনন্দাকে খারাপ লাগল ওর। সুনন্দা কি বোঝাতে চাইছে নীরেনের আত্মহত্যার ব্যাপারে তারও দায়িত্ব আছে ? চকিতে টেবিলের উল্টোদিকটা দেখে নিল সীতেশ। হরষিত যদি ব্যাপারটা টের পেয়ে যান তাহলে অনেকেই তার ওপর নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে।

সে যেন কাউকে শোনাতে চায় না এমন গলায় প্রশ্ন করল, 'মারা গেছে ?'

'এখনও নয়। আমি অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করেই তোমায় করছি—।'

যেন সমুদ্রের তলা থেকে হুস করে ওপরে উঠে নিঃশ্বাস নিল সীতেশ।

যাক বাবা, এখনও মরেনি। 'কোন হসপিটাল?'

নামটা শুনে সীতেশ গলা পাল্টালো, 'আমি দেখছি।'

টেলিফোনটা নামাতেই সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে স্যার, এনিথিং রং?'

সীতেশ বুঝতে পারছিল এর মধ্যেই তার শরীরের পরিবর্তন হয়েছে। অন্তত ঘামগুলো এই ঠাণ্ডা ঘরে বসেও শরীরে থাকতে চাইছে না। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ চেপে কিছুক্ষণ বসে রইল সীতেশ। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। কি হবে এখন? সোমনাথ যে প্রশ্নটা করেছে সেটা তার মাথায় ঢোকেনি।

হরষিত উঠে দাঁড়ালেন, 'মনে হচ্ছে আপনি খুব ডিস্টার্বড!'

ঝাপসা চোখে তাকালো সীতেশ, 'হ্যাঁ, মানে তেমন কিছু নয় অবশ্য—।'

হরষিত বললেন, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা আগামীকাল বসতে পারি, আজ বরং আপনি রেস্ট নিন। খুব সিক্ দেখাচ্ছে আপনাকে।'

মনে মনে এই প্রথম হরষিতকে ধন্যবাদ জানালো সীতেশ। তারপর নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। হরষিত আর দাঁড়ালেন না, টেবিল থেকে ফাইলটা তুলে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। দেখাদেখি সোমনাথও উঠে দাঁড়িয়েছিল। একটু ইতস্তত করে সেও বেরিয়ে গেল।

রুমালটা ততক্ষণে বেশ ভিজে উঠেছে। সীতেশ ভেবে পাচ্ছিল না কি করা যায়! নীরেনটা এমন বোকামী করতে গেল কেন খামোকা! উঃ, কাল সকালের কাগজে যদি খবরটা ছাপা হয় তাহলে সীতেশ কতক্ষণ দূরে থাকবে? গর্দভটা কোন চিঠিপত্র লিখে গেছে কিনা কে জানে! খবরের কাগজওয়ালারা তো এরকম নিউজ পেলে শকুনের মত নেমে আসবে। বিখ্যাত গাইয়ের স্বামী যখন হীরো তখন তার আত্মহত্যা তো অবশ্যই রসালো।

এবার সোজা হয়ে বসলো সীতেশ। নীরেনকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। নীরেন যদি বেঁচে যায় তাহলে আর ভয় নেই। ক্ষমতার

হাতগুলো এত লম্বা যে ঠিকঠাক মুখগুলো বন্ধ করে দিতে বেশি সময় লাগবে না। শুধু মারতে দেওয়া চলবে না নীরেনকে। তার জন্যে যত খরচ হয় হোক।

ঠিক এই সময় দু নম্বর টেলিফোনটা বাজলো। রিসিভার তুলতেই জুনিয়ারের গলা কানে এল, 'কোন খারাপ খবর আছে?'

সীতেশ চকিতে বুঝতে পারল হরষিত এর মধ্যেই রিপোর্ট করেছেন। জুনিয়রের গলা শোনা গেল, 'আপনার শরীর খারাপ হলে—!'

'আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ।' লাইনটা কেটে দিল সীতেশ। এই অফিসে সীতেশই একমাত্র লোক যে জুনিয়রের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে পারে।

মুখে বলল বটে কিন্তু সীতেশ যে ঠিক নেই তা বোঝা গেল যখন সে নিজস্ব টেলিফোনের নম্বর ঘুরিয়েও ওপাশ থেকে কোন সাড়া পেল না। বাজছে তো বেজেই যাচ্ছে একটানা। তার মানে সুনন্দারা এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে? তখন মাথায় ক্লিক করেনি, নইলে এসব ক্ষেত্রে হস-পিটালের চেয়ে নার্সিংহোম অনেক সুবিধের। সুনন্দাকে সেকথা বলে দিলে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। হসপিটাল মানেই বারোয়ারী ব্যাপার, কথা চালাচালি, সরষে থেকে টেনে ভূত বের করা। সুনন্দার অবশ্য বাড়ির কাছাকাছি হসপিটালের কথাটাই মনে এসেছে। যা হবার তা তো হয়েছে, কিন্তু এখনই সামাল দেওয়া দরকার। প্রথমত, নীরেনকে বাঁচানো দরকার, দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে কাকপক্ষীতে যেন ব্যাপারটা টের না পায়।

সীতেশ আর একবার মুখ মুছলো। ভেজা রুমালে মুখ ঘষলেই গা ঘিনঘিন করে। সীতেশ চোখ বন্ধ করেও কিছু ভেবে পেল না। এই চেয়ারে বসা মানেই অজস্র ক্ষমতার সুতো মুঠোয় রাখা। অথচ সে কিছুই করতে পারছে না। হসপিটালের সেরা ডাক্তারকে ফোন করা যেতে পারে, নিজে ছুটে গিয়ে নীরেনের বিছানার পাশে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু এসব কিছুই করা যাবে না। আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত কোলকাতায় ঢিঢি পড়ে যাবে। নীরেন যদি মরে তাহলে তো হয়েই গেল।

অনেক ভেবেচিন্তে সীতেশ অপারেটরকে বলল দিলীপ মিত্রকে ডেকে

দিতে। দিলীপের টেবিলে সরাসরি কোন টেলিফোন নেই, থাকলে নিজেই ডাকত। বছর কয়েক হল দিলীপের সঙ্গে এই অফিসে ওর দেখা হয় না। একজন যদি দোতলার সিঁড়িতে মুখ ঘষছে তো আর একজন দশতলায়। বাল্যবন্ধু দিলীপকে একসময় সীতেশই চাকরিতে ঢুকিয়েছিল এবং সেদিনই বন্ধুত্বকে মেরে ফেলতে হয়েছিল। সীতেশের সঙ্গে কথা বলার সাহস দিলীপের সহকর্মীরা স্বপ্নেও পায় না। সীতেশ না বললেও দিলীপ সেটা বুঝে নিয়েছিল।

দিলীপ এল। ওকে দেখে সীতেশ একটু সন্ত্রস্ত হল। মাথায় টাক পড়েছে, ভুঁড়িটা বেশ স্থূল, গায়ে খদ্দরের ময়লা পাঞ্জাবি আর ধুতি। সেই তুলনায় এক বয়সী হয়েও সীতেশ দারুণ ফিটফাট। চুলে অবশ্য রঙ বোলাতে হয়, কিন্তু দিলীপের মত এতটা বুড়িয়ে যায়নি সে। ঘরে ঢুকে দিলীপ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সীতেশ তার দিকে একবার তাকিয়ে বেল বাজাতেই পিয়ন উঁকি দিল, 'আমার ঘরে এখন কেউ যেন না ঢোকে। আয় দিলীপ, বোস।'

একটা চেয়ার টেনে দিলীপ বসে ওর মুখের দিকে তাকাল।

সীতেশ পেপার ওয়েট তুলে নিল হাতে। একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'সুনন্দাকে তোর মনে আছে ?'

দিলীপের চোখের মণি একটু স্থির হল, ভেবে ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'সুনন্দার খুব বিপদ, ওর স্বামী নীরেন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। জানি না এতক্ষণ বেঁচে আছে কি না, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই—।' কথাটা শেষ করল না সীতেশ। ও দিলীপকে ঠিক বুঝতে পারছিল না।

এতক্ষণে দিলীপ কথা বলল, 'কোন হাসপাতাল ?'

'পি জি।'

'আমাকে কি করতে হবে ?'

'আমি চাই নীরেন যেন না মরে আর এই ব্যাপারটা অপ্রচারিত থাকে।'

দিলীপ একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'প্রথমটা হলে আমার কিছুই

করার থাকবে না, তবে দ্বিতীয়টা যাতে না হয় আমি দেখব।'

সীতেশের ইচ্ছে করছিল দিলীপের হাত জড়িয়ে ধরে। কিন্তু টেবিলটা বড্ড চওড়া, বুকের ভার অনেকটা সহজ হচ্ছে এমন গলায় সে বলল, "দিলীপ, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।'

দিলীপ হাসলো, তারপর উঠে দাঁড়ালো, 'তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আই উইল বি হিয়ার, তোমার ফোন না পাওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো।' সীতেশের হঠাৎ খুব অবসন্ন লাগছিল। এই ঘর এই চেয়ার ছেড়ে এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না তার।

দিলীপ চলে গেছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অথচ কোন খবর নেই। সীতেশের মনে পড়ল না দিলীপ তার ব্যক্তিগত টেলিফোনের নম্বর জানে কি না। অপারেটরের মাধ্যমে এসব কথা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু একটা কিছু খবর তো এর মধ্যে দিলীপ জানাতে পারতো। দিলীপকে পূর্ণ বিশ্বাস করে সীতেশ। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অনেক কীর্তির সাক্ষী দিলীপ কখনো মুখ খোলেনি। অতএব দিলীপ কিছু একটা হলে নিশ্চয়ই তাকে জানাতো। হয়তো এখনও নীরেনের প্রাণ শরীরে রয়ে গেছে।

সুনন্দার গলা শুনে মনে হয়েছিল বেচারা খুব ভেঙে পড়েছে। অন্তত নীরেন শব্দটাকে ও কখনো এমন ভাবে উচ্চারণ করেনি। স্বামীকে যে কোনদিন মেনে নিতে পারেনি সে এই মুহূর্তে অমন ভেঙে পড়েছে কেন? নাকি পুরোটাই সীতেশের ভুল। সুনন্দা কি নীরেনকেই মনে মনে চাইতো, মুখে অন্য কথা বানাতো?

তা কি করে হয়? তাহলে তো সব দেখাই মিথ্যে হয়ে যায়। মোটা-সোটা বেঁটে নীরেন স্বামী হিসেবে অবশ্যই অপদার্থ ছিল। এককালে ভাল ছবি আঁকতো, তা প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল। এই কুড়ি বছর ধরে সেই আঁকার স্মৃতি ভাঙিয়ে চলেছে তার। অল্পবয়সী আর্টিস্টদের নিয়ে দঙ্গল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, আকণ্ঠ মদ গেলে। স্কুলের আঁকার মাস্টারের চাকরিটা যায় না বলেই আছে। ইংলিশ মিডিয়ামের নামী স্কুলের চাকরিটায়

সীতেশই জুড়ে দিয়েছিল সুনন্দাকে। তাই একটুও বিপাকে পড়েনি ওদের সংসার। নীরেনের অস্তিত্ব শুধু সুনন্দার উপাধিতে এরকম একটা সত্য জেনে এসেছে সীতেশ এতকাল। আজ সেটা ভুল হয়ে যাবে কি করে?

সুনন্দাকে চেনে সরমাও। সীতেশের স্ত্রী। চেনে ছেলেমেয়েরাও। সুনন্দা ওদের পিসি। সরমা কতটা জানে সীতেশ জানে না। পৃথিবীতে এইসব মেয়ের সংখ্যা বেশি যাদের কোন চাহিদা নেই, ছেলেমেয়ে ঠাকুর-ঘর আর রান্নার ব্যবস্থায় যাদের দিনরাত দিব্যি কেটে যায়। সীতেশের বাড়িতে সুনন্দা এসেছে কোন অনুষ্ঠানের সূত্রে। এবং সেই সময় সঙ্গে এনেছে নীরেনকে। এইটে সুনন্দা পারতো। কি করে পারতো জানে না সীতেশ। অন্য সময় অনেক রাত পর্যন্ত সুনন্দার বাড়িতে কাটিয়েও নীরেনের দেখা পায়নি সীতেশ। সরমা আছে, অভ্যাসের সঙ্গে জড়ানো নিশ্চয়তার মতো। ঘরটাকে ছিমছাম পরিষ্কার রাখে। সুনন্দা তার খোলা জানলায় ঝিরঝিরে বাতাস, অস্তিত্ব সীতেশকে জুড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে কখনো বাধা হয়নি নীরেন।

সবকিছু ঠিকঠাক রেখে বেশ চলছিল দিনগুলো। বয়সের তুলনায় একটু বুড়িয়ে গেছে সরমা। মনে তো বটেই, সমস্ত শরীরে এখন মা-মা ভাব। ওর কাছে গেলে নিজেকেই সন্তান বলে মনে হয় সীতেশের। অথচ সুনন্দা সেই একই রকম, তাজা এবং রহস্যময়। সীতেশ দেখেছে কোন কোন মেয়ে এটা পারে, কিছুতেই তাদের জমার ঘর খালি হয় না। বরং মাঝে মাঝে সুনন্দা তাকেই ঠাট্টা করে। বলে, তুমি আর আগের মতন নেই, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়। কথাটা মিথ্যে নয়। সুনন্দার সুঠাম নিরাবরণ শরীরের দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে এক ধরনের ঈর্ষা অনুভব করে না কি সীতেশ? যেন দীর্ঘ পথ একই তালে দৌড়ে এসে একজন পিছিয়ে পড়ছে আর অন্যজন তেমনি জোরালো পায়ে দূরত্ব বাড়াচ্ছে। সীতেশ দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করতো রসিকতায়, 'আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, মনে রেখ।'

'উঁহু, আমি এক আছি কিন্তু তুমি দ্বিমুখী। ডাবল খরচ করছ বলে আমার আগে ফুরিয়ে যাচ্ছ।'

এই কথাটা শুনলেই মন তেতো হয়ে যায়। এই জন্যে নয়, সুনন্দা ইঙ্গিত করল সরমার সঙ্গেও তার শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বোঝাল, নীরেনকে ও কিছুই দেয় না বা দিতে হয় না। অবিশ্বাস এক-সময় চেহারা পাল্টায়, এখন কথাটাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে সীতেশ। নীরেন শুধুই স্বামী আর কিছু নয়।

নীরেনকে শেষ দেখেছিল তিনদিন আগে। টিপটিপে বৃষ্টি ঝরছিল সকাল থেকে। আকাশ ভরতি মেঘ। এরকমটা হলে এই বয়সেও মন খারাপ হয়ে যায় সীতেশের। অফিসের কাজ ভাল লাগছিল না। যদিও ওর এই ঠাস-ঘর থেকে আকাশ দেখা যায় না, তবু আসার পথে দেখা আকাশটা ঘুমিয়ে ছিল বুকের মধ্যে। দিনটার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এসেছিল সীতেশ। রাস্তায় লোকজন কম। অনেককাল হাঁটাহাঁটি কিংবা ট্রাম-বাসে চড়া হয় না। গাড়ি নিয়ে পার্ক স্ট্রীটে চলে এসেছিল। লেবুর রস দিয়ে জিন খেলে মন্দ হয় না। অলিম্পিয়াতে ওর প্রিয় একটা টেবিল আছে। কিন্তু হঠাৎ মন পাল্টে গেল। না, মদ নয়, বরং সুনন্দার কাছে যাওয়া যাক। কিন্তু সুনন্দা তো এখন স্কুলে। থাক, তবু ওর বাড়িটা তো আছে।

সটান চলে এসেছিল সীতেশ। বড় রাস্তার পেট্রল পাম্পে গাড়িটাকে রেখে গলিটা হেঁটে এসেছিল। সুধা, সুনন্দার কাজের লোক, দরজা খুলে বলেছিল, 'ওরা কেউ নেই।' সীতেশ বলেছিল, 'জানি, আমার শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।'

সীতেশকে চেনে সুধা, কতটা চেনে বোঝা যায় না, আপত্তি করেনি। জুতো ছেড়ে সুনন্দার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছিল সে। এঘরে যখনি সে এসেছে একটার বেশি বালিশ দেখেনি। ছিমছাম সাজানো ঘরে সুনন্দার কিশোরী মুখ ফ্রেমে বাঁধানো। কোথাও নীরেন নেই শুধু বাঁ দিকের দেওয়ালে ছাড়া। সেখানে নীরেনের যৌবনে আঁকা সেলফ পোর্ট্রেট এখনও কি করে ঝোলে বুঝতে পারে না সীতেশ। অনেকদিন অনেক আন্তরিক মুহূর্তে ওই নীরেনের চোখ দুটো তাকে ভীষণ জ্বালিয়েছে। আজ বিছানায় শুয়ে সীতেশের ইচ্ছে হল ছবিটাকে উল্টে দেয়, কিন্তু সুনন্দা

এলেই সেটা টের পেয়ে যাবে। খামোকা অন্যকে নিজের ভেতরটা দেখিয়ে কি লাভ!

এই ঘরে সুনন্দা ছড়ানো। ওর শরীরের গন্ধ বিছানায় মাখামাখি। টানটান শুয়ে সীতেশের বেশ আমেজ আসছিল, একটু ঘুম ঘুম ভাব। এমন সময় কলিং বেল আওয়াজ করতেই সে সজাগ হল। এত তাড়াতাড়ি সুনন্দা আসবে সে আশা করেনি। এখন একটু ঘুমের ভান করলে কেমন হয়?

সুধাকে কথা বলতে শুনছিল সে। না, সুনন্দা নয়। পুরুষ কণ্ঠ, সীতেশ একটু আড়ষ্ট হল, নীরেন মনে হচ্ছে। এই সময় নীরেন কি রোজ বাড়ি ফেরে? সীতেশ বুঝতে পারছিল না তার কি করা উচিত।

নীরেনই এল। দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার, শরীর খারাপ?' যেন সীতেশ এ বাড়িরই লোক জিজ্ঞাসায় এমন ভঙ্গি।

সীতেশ উঠল না। মাথা উঁচু করলেই তো সমস্যা বাড়ে। ঈষৎ ঘাড় নাড়ল।

নীরেন বলল, 'সুনু জানে?'

সীতেশ বলল, 'না। অবশ্য তেমন কিছু নয়।'

'ঠাণ্ডাফাণ্ডা লাগিয়েছেন বোধহয়। অবশ্য আজ যা ওয়েদার সবকিছু গুবলেট হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।' নীরেন ঘরে ঢুকে দেওয়ালের দিকে এগোল।

সীতেশ দেখল ওর পরনে সরু পাজামা আর বাফতার পাঞ্জাবি। মুখে সামান্য দাড়ি। দেওয়াল থেকে ছবিটাকে খুলতে দেখল সীতেশ। নীরেন দু-হাতে সেটাকে নিয়ে অদ্ভুত চোখে একবার দেখে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়তে চাইলো। সীতেশ বেশ অবাক হয়েছিল। একটু আগেই সে ছবিটার কথা ভাবছিল আর এখন সেটা সরে এসেছে দেওয়াল থেকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হবে?'

'বেচে দেব। ফালতু পড়ে ধুলো খাচ্ছে।'

'না বেচলেই নয়?'

নীরেন হাসলো, 'বেচলে তো নষ্ট হচ্ছে না ছবিটা। কোন একজনের

কাছে তো থেকে যাবে। মাঝখান থেকে এরকম একটা দিন চুটিয়ে এন্‌জয় করা যাবে। গরিব মাস্টারের মাসের শেষটা খুব ভয়ঙ্কর।'

'কি রকম দাম পাওয়া যাবে ?'

'কত আর ? শ'খানেক বড়জোর।'

'ছবিটা যদি আমি কিনি ?'

'সেকি ! কেন ?'

'দেখতে দেখতে মায়া পড়ে গেছে না হয়।'

'যাচ্চলে !'

সীতেশ ব্যাগ খুলে একটা একশ টাকার নোট টেবিলের ওপর রাখল। নির্লিপ্ত হাতে সেটা তুলে নিল নীরেন, 'যাক, আমার অনেক ঝামেলা কমে গেল। আমি যা বিক্রি করি তা কিন্তু রাখি না। সুধাকে বলছি কাগজে মুড়ে দিতে।' ছবিটাকে তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে উঠল, 'খাওয়া-দাওয়া হবে নাকি ?'

সীতেশ ঘাড় নাড়ল, 'নাঃ।'

'শরীর খারাপ আর থাকতো না।'

'ইচ্ছে করছে না।'

নীরেন কাঁধ নাচালো। তারপর সুধার সঙ্গে কথাবার্তা সেরে বেরিয়ে গেল।

একটু বাদেই ছবিটাকে কাগজে মুড়ে সুধা এল, টেবিলে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবেন ?'

ইচ্ছে করছিল কিন্তু তবু না বলল সীতেশ। সুনন্দা এলেই হবে। এই সময় বৃষ্টি নামল। বেশ জোরে, এমন কি জানলাটাও বন্ধ করে দিতে হল।

সুনন্দা এসে গেল আধঘণ্টার মধ্যেই। কলিং বেলটা আওয়াজ করতেই সীতেশের চেতনা প্রখর হয়েছিল। সুধা খুলতে দেরি করছিল বলে সামান্য রাগারাগি, চা করতে বলা এবং শেষ পর্যন্ত এই ঘরে এল সুনন্দা। ভিজে একসা হয়ে গিয়েছে। সীতেশ চিৎপাত হয়েছিল বিছানায়। আলো জ্বালা নেই এবং জানলা বন্ধ বলে ঘরে প্রায় কালো ছায়া। পর্দা সরিয়ে যতখানি

চমকাবার কথা ততখানি চমকালো না। বলল, 'ওমা, তুমি কখন এলে ?'

'অনেকক্ষণ !' সীতেশ পাশ ফিরে শুলো। সুনন্দা ইজ সামথিং। এই বয়সে যখন অন্য নদী মজে যায় তখন সুনন্দা গভীর জল নিয়ে বয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই বৃষ্টিতে ভিজে শরীরে কাপড় সেঁটে ধরে আর এক ধরনের টান এনে দিয়েছে। মুখের মেক-আপ ভেসে গেছে। সীতেশ জানে সাজ-গোজ করার চাইতে কিছু না সাজলেই সুনন্দাকে বেশি সুন্দর দেখায়। সীতেশ জিজ্ঞাসা করল, 'ছুটি হয়ে গেল ?'

সুনন্দা ব্যাগটা টেবিলে রেখে বলল, 'মাথা খারাপ, তুমি এসেছ শুনে ছুটে এলাম।'

'কে খবর দিল ?'

'তিনি।' সুনন্দা ঢুকে গেল স্নানের ঘরে।

এবার উঠে বসল সীতেশ। নীরেন বাইরে বেরিয়ে এই উপকারটুকু করে গেছে। এ বাড়ি থেকে টেলিফোন করলে টের পেত সীতেশ। লোকটা কি একটুও জেলাস হয় না ? ব্যাপারটা বেশিক্ষণ মাথায় খেললো না, কারণ সুনন্দা এখন পাশের ঘরে। ওর বের হতে যত দেরি তার মধ্যে সুধার চা দিয়ে যাওয়া সারা।

বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশের মত নির্মল মুখে ঘরে এল সুনন্দা। বলল, 'চা দিয়ে চলে গেছে ? মেয়েটার কোনাদিন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না !'

'কার ?'

'সুধার কথা বলছি।'

'তাই বল !'

'ইয়ার্কি হচ্ছে, না ?' প্রায় তেড়ে এল সুনন্দা। সীতেশের চোখ যে ওর হাউসকোটের বোতামে, এটা নজর এড়ায়নি।

দু হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল সীতেশ। সুনন্দার ঠাণ্ডা অথচ মিষ্টি গন্ধ মাখা বুকে মাথা রাখল। জুড়িয়ে যায়, এই সময় সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়ে যায়। সুনন্দার হাত এখন সীতেশের কাঁধে, চুলের গোড়ায় আঙুল।

চা জুড়িয়ে গিয়েছিল। পাতলা সরের চেহারা কাপের ওপরে। এ

বাড়িতে সুধা ছাড়া কেউ নেই। সুধা কতটা জানে সীতেশ জানে না কিন্তু সুনন্দা তার সঙ্গে থাকলে সে কখনই এ ঘরে ঢোকে না। এটা যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

সীতেশের পাশে শুয়ে সুনন্দা বলল, 'তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ!'

'কি রকম?'

'চুল পেকে যাচ্ছে, মুখে ভাঁজ পড়ছে—।'

'ব্যাস?'

বাজুতে চিমটি কাটলো সুনন্দা, 'ইয়ার্কি!' তারপর উপুড় হয়ে বলল, 'সে তো এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। আর পারি না বাবা!'

কথাটায় এমন একটা সুর ছিল যে সীতেশ হো হো করে হেসে উঠে-ছিল। আর সেই সময় সুনন্দার গলা তীক্ষ্ণ হল, 'ছবিটা কোথায়?'

ওর চোখ এখন দেওয়ালের যেখানে একটু সাদাটে ভাব বেশি। সীতেশ বুঝেও না বোঝার মুখ করল, 'কিসের ছবি?'

'একটা সেলফ পোর্ট্রেট ছিল ওর, কে সরাল সেটাকে।' ধড়মড়িয়ে উঠে বসে হাউসকোটের বোতাম ঠিক করল সুনন্দা। সীতেশ দেখল ওর মুখটা অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। এখনই সুধাকে জেরা শুরু করবে বুঝতে পেরে সীতেশ ওর হাত ধরল, 'ছবিটা কি খুব জরুরী?'

'মানে? তুমি জান?'

'জানি। নীরেন ওটাকে খুলেছিল বিক্রি করবে বলে।'

'সেকি! এতদিন পরে এটার ওপর নজর পড়ল!' সুনন্দার দাঁত ঠোঁট চেপে ধরেছে। এই ভঙ্গি সীতেশের সব গোলমাল করে দিচ্ছিল। সুনন্দার তার পাশে শুয়ে থাকা আর ছবিটা সরানোর জন্যে ক্ষোভ— কোনটা সত্যি?

সীতেশ বলল, 'আমি ওকে বিক্রি করতে দিইনি। টেবিলের ওপর রয়েছে।'

সুনন্দার চোখ সেদিকে ঘুরল, 'কাগজে মোড়া কেন?'

'সেজেগুজে বেরুচ্ছিলো তাই।' সীতেশ একটা কারণ দেখালো।

হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে তাকাল সুনন্দা, 'তুমি কিনেছ?'

'ঠিক কেনা নয়, টাকাটা দিয়ে রেখে দিয়েছি।'

'কত ?'

'একশ।'

সুনন্দা খাট ছেড়ে উঠল। তারপর আলমারি থেকে একশ টাকার একটা নোট বের করে সীতেশের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার কাছ থেকে আমি কিনে নিলাম।'

ততক্ষণে সীতেশের বুকে অনেক নুড়ি জমে গেছে। উঠে বসে বলল, 'টাকাটা দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না।'

'সে তুমি বুঝবে না।'

এর পরে আর কথাবার্তা জমেনি। আর কি আশ্চর্য, সীতেশেরও মনে পড়ে গেল অফিসে একটা জরুরী কাজ ফেলে এসেছে। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ একদম ছিমছাম। পেট্রল পাম্পের দিকে হাঁটতে হাঁটতে নীরেনকে অসহ্য মনে হচ্ছিল তার।

দিলীপ ফিরল সন্ধ্যে পার করে। এই সময়টা সীতেশ চুল চিরে চিরে পার করেছে। দিলীপকে দেখে সোজা হয়ে বসল। দিলীপের মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে এতক্ষণ অনেক ঝড় সামলে এসেছে সে। সীতেশ চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'বল ?'

'এ যাত্রায় বেঁচে গেল।' দিলীপের গলায় ক্লান্তি।

'কোন স্টেটমেণ্ট দিয়েছে ?'

'না।'

কথাটা শুনে খুব হালকা লাগলো সীতেশের। নীরেন এইটে অন্তত মূর্খের মত করেনি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনো ঝামেলা হবে না তো ?'

'আর হবে না।'

'কত নম্বর বেড ?'

দিলীপ সঠিক ঠিকানাটা জানিয়ে বলল, 'এবার আমি যেতে পারি ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' সীতেশ ঠিক বুঝতে পারছিল না কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো যায়। দিলীপ উঠে পড়ল। দরজার কাছে যখন পৌঁছে গেছে

তখন সীতেশ বলতে পারল, 'তুমি আমার বিরাট উপকার করলে।'

দিলীপ সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর দরজায় হাত রেখে স্পষ্ট গলায় বলল, 'কিছু মনে করো না, পুরনো অভ্যেসগুলো এবার ছেড়ে দেওয়া ভাল। এইসব ঝামেলা ডেকে এনে কি লাভ।'

সীতেশ মাথা নিচু করল। দিলীপ আর দাঁড়ায়নি। কিছুক্ষণ পর যে একটু উষ্ণতা আসেনি তা নয় কিন্তু এই মুহূর্তে দিলীপকে ক্ষমা করে দিল সে। অতীতে বান্ধবীঘটিত ব্যাপারে দিলীপ তাকে সাহায্য করেছে। বোধহয় তারই ইঙ্গিত দিয়ে সে জানিয়ে গেল, আর কেন?

সীতেশ হাসল। কোন মেয়ে যদি তাকে ভালবাসে এবং তারও যদি তাকে খুব পছন্দ হয় তাহলে সে কি করবে? আর ঝামেলাগুলো হওয়ার আগে তো বোঝা যায় না যে ঝামেলা আসছে। এই তো সেদিন নীরেন কি স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে কথা বলল। অবশ্য দিলীপকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি কি খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল নীরেন কিংবা কেন করেছিল। এই সব ভাবতে গিয়ে সীতেশ বুকের গভীরে অদ্ভুত টান বোধ করছিল। সুনন্দা কি তাকে আশা করছে না? তার কি উচিত নয় সুনন্দার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো? সুনন্দাকে বিপদ থেকে সে বাঁচিয়েছে ঠিক কিন্তু নিজেকে নিরাপদে রেখেই তা করেছে। কেন? শুধু স্ক্যাণ্ডালের ভয়ে নাকি—!

সীতেশ রুমালে মুখ মুছে টয়লেটে গেল। আয়নায় নিজের মুখ দেখলো। বয়স্ক, খসখসে চামড়া, সাদাটে চুল—প্রৌঢ়দের যেমন হয়। নিজেকে দেখতে গিয়ে সুনন্দাকে বেশি করে মনে পড়ল। সুনন্দা নীরেনকে নিয়ে কি করছে? বিছানার পাশে শুয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে? নাকি এখনও কেঁদে চলেছে সুনন্দা?

হসপিটালে অনেকদিন বাদে এল সীতেশ। এখন সামান্য কিছু হলে ওকে বেলভিউতে যেতে হয়। এরকম একটা বারোয়ারী জায়গায় এসে ওর স্বস্তি হচ্ছিল না। ভিজিটার্সদের সময় অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। অথচ সামান্য দু'পাঁচ টাকা ব্যয় করলে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করা যায়। বেশ নির্জন হয়ে আছে করিডোর। নির্দিষ্ট নম্বরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। সুনন্দা কি এখনও আছে?

পর্দা সরালো সীতেশ। সরাতেই চোখাচোখি হল। ঘরের এক কোণায় চেয়ারে বসে সুনন্দা পত্রিকা পড়ছিল। পর্দা নড়তেই এদিকে তাকিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুই চোখ উজ্জ্বল, ঠোঁটের কোণে পরিষ্কার হাসি। নীরেন শুয়ে আছে মড়ার মত। চোখ বন্ধ।

সুনন্দা ছুটে এল, 'এসেছ?'

নীরেনের দিকে তাকিয়ে সীতেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছে?'

'ভাল। দিলীপবাবু সব সামলে গেছে।'

'হুঁ। তোমার আশায় বসে ছিলাম। তুমি এলেই চলে যাব ভেবেছিলাম।' সীতেশ সুনন্দার দিকে তাকালো। সুনন্দার মুখে এখন কোন মেক-আপ নেই, খোলা চুল, আটপৌরে শাড়ি। কিন্তু বেশ বয়স্কা দেখাচ্ছে ওকে, গাল যেন একটু ঝুলে গেছে। সে বলল, 'খুব ঝামেলা সইলে!'

সুনন্দা এখন ওর বুকের সামনে। মাথাটা কি নেমে আসছিল সুনন্দার? সীতেশ নড়ে উঠল। তারপর পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকল।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে নীরেনের মুখের দিকে তাকাল সীতেশ। চোখ বোঁজা। একটু আগে টয়লেটের আয়নায় দেখা মুখটাই যেন এখন বিছানায় নিঃশব্দে পড়ে আছে। পৃথিবীর সমস্ত অখুশি মুখগুলো কি একই রকম দেখতে?

বাজুতে স্পর্শ পেল সীতেশ। সুনন্দা এসে দাঁড়িয়েছে। ফিসফিস করে বলল, 'ওই ছবিটা দেওয়ালে দেখেই ক্ষেপে গেল। বলল, 'তুমি ওটা রেখে গিয়ে ওকে অপমান করেছ! ওটা যে আমি কিনেছি বিশ্বাস করল না। উন্মাদ!'

এই সময় নীরেনের শরীর নড়ে উঠল। চোখের পাতা কাঁপছে। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হল পাতা, চোখ মেলল নীরেন। প্রথমে পরিষ্কার দৃষ্টি, তার পরেই কুঁচকে গেল চামড়া। সেই দৃষ্টির সামনে কেঁপে উঠল সীতেশ। একটা নিঃশ্বাস ফেলল নীরেন তারপর মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করল।

সীতেশের এবার খেয়াল হল সুনন্দার হাত এখনও তার বাজুতে। ফিসফিসিয়ে সুনন্দা বলল, 'চল, আর পারছি না।'

'কিন্তু— ।'

'ওকে ঘুমুতে দাও। কিন্তু আমি আজ একা থাকতে পারব না।'

সীতেশ দেখল নীরেনের মুঠো করা হাত খুলে যাচ্ছে। আঙুলগুলো একটু একটু করে প্রসারিত হচ্ছে। সাদা, নিরক্ত আঙুল।

এবার হাতের মুঠোয় সুনন্দার চাপ। হঠাৎ এই ঘরের ওষুধের কড়া গন্ধ ছাপিয়ে একটা গা ঘিনঘিনে গন্ধ সীতেশের শরীরে প্রবেশ করল। সেই গন্ধটা যেন ঢেউএর মত তাকে নিয়ে লোফালুফি করছে আর সে একটা বুড়ো কীটের মত চেষ্টা করছে সাঁতরে যেতে।

সীতেশ চাপা গলায় বলল, 'ছবিটা আমার চাই।'

শিথিল হল স্পর্শ, সুনন্দা বেশ অবাক, বলল, 'কেন ?'

'আমার দরকার আছে।'

'কি আশ্চর্য ! ওটা তো নীরেনের সেল্‌ফ পোর্ট্রেট। তুমি নিয়ে কি করবে ?'

সীতেশ মাথা নাড়ল, 'ওটা আমারও, আমারও।'